বাঙ্ময়ী মা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি
কলিকাতা

প্রকাশক ঃ
পাবলিকেশন ডিভিসন,
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি
"মাতৃমন্দির"
৫৭/১, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-৭০০০১৯

১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, ১৯৯৫

মূল্য RS. 40/-

মুদ্রক ঃ
নিরালা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩১/১/এ, নবীন চাঁদ বড়াল লেন
কলিকাতা ৭০০০১২

বাঙ্ময়ী মা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সূচীপত্র ও নির্ঘণ্ট

পৃষ্ঠা

প্রকাশকের নিবেদন ক

ভূমিকা .....ডাঃ ত্রিগুণা সেন চ

নির্বাচিত শিরোনামা/আনুষঙ্গিক উল্লিখিত বিষয়

অখণ্ড আনন্দ ১

অখণ্ড ও খণ্ড ব্রহ্ম ২

অখণ্ড ও খণ্ড মা ৩

অখণ্ডজ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞান কর্ম দ্বারা।
পাইবার নয় ['কৃপা ও পুরুষকার' দ্রষ্টব্য]

অজ্ঞান ও জ্ঞান ['জ্ঞান ও অজ্ঞান' দ্রষ্টব্য]

অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানলাভ ৫

অজ্ঞানের আবরণ দূর করিবার উপায়
['অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানলাভ' দ্রষ্টব্য]
অজ্ঞানের পর্দা ও জ্ঞানের দরজা
['ব্রহ্মোপলব্ধি জ্ঞান-অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে' দ্রষ্টব্য]
অদ্বৈত অবস্থায় মায়ের ব্যবহার
[অদ্বৈত ও দ্বৈত' দ্রষ্টব্য]
অদ্বৈত ও দ্বৈত ৮
অদ্বৈত স্থিতি ['বিভূতির প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]
অদ্বৈত স্থিতিতে বিভূতির প্রকাশ নাই
['বিভূতির প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]
অধোগতিতে কাম ও ঊর্ধ্বগতিতে প্রেম
['সংসার ও আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
অনন্তের মধ্যে এক, একের মধ্যে অনন্ত
['অদ্বৈত ও দ্বৈত' দ্রষ্টব্য]

অনাহত ধ্বনি ['কুণ্ডলিনী শক্তি' দ্রষ্টব্য]
['গুরুমুখে মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া জপ' দ্রষ্টব্য]
অন্তর্যামিনী মা
['অখণ্ড ও খণ্ড মা' দ্রষ্টব্য]
['মা অন্তর্যামিনী' দ্রষ্টব্য]
অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথের কোল ও মায়ের
কোল—এই দুইয়ের মধ্যে কোন
পার্থক্য আছে কি ? ['মায়ের কোল' দ্রষ্টব্য]
অনুভূতি ও বিচার ['প্রারব্ধ কি' ? দ্রষ্টব্য]
অভাব জাগাইয়া রাখাই জাগতিক জিনিসের স্বভাব
['নামে রুচি ও আনন্দ লাভের প্রশ্ন' দ্রষ্টব্য]
অভাববোধ হইলে, সিদ্ধি হাতের কাছে আসে
['নাম-জপ' দ্রষ্টব্য]
অভাববোধের প্রয়োজনীয়তা ['নাম-জপ' দ্রষ্টব্য]

অভাবের রাজ্য ও স্বভাবের রাজ্য ১৩
অভ্যাস ও শুদ্ধ সংস্কার ১৫
অমৃত স্বয়ংপ্রকাশ
['অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানলাভ' দ্রষ্টব্য]
অশুচি-শুচি ভগবানে নাই
['ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে ঃ
ব্রহ্মানুভূতি লাভের পথ' দ্রষ্টব্য]
অসম্ভব কিছুই নয়, ভগবানের রাজ্যে
['পুরুষকারের মহিমা' দ্রষ্টব্য]
অসীম ও সীমাবদ্ধ মা
['অখণ্ড ও খণ্ড মা' দ্রষ্টব্য]
অহং ও সোহহং
['ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের
সহজ উপায়' দ্রষ্টব্য]

অহঙ্কার ['সাধনপথে অহঙ্কার অন্তরায়' দ্রষ্টব্য]
['প্রণামে অহং-বোধ ত্যাগ' দ্রষ্টব্য]
অহঙ্কার, ত্যাগের মধ্যেও
['ত্যাগও একরূপ বন্ধন' দ্রষ্টব্য]
আকাঙ্খা মহান রাখিতে হয়
['সাধনা ও আশা' দ্রষ্টব্য]
আত্মজনবিয়োগে শোক অনুচিত ১৬
আত্মসমর্পণ, নিজের করণীয় কিছুই নাই - এই বুদ্ধি
আত্মসমর্পণ আনে
['পুরুষকার ও কর্ম' দ্রষ্টব্য]
আত্মা সর্বভূতে ১৮
['জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম' দ্রষ্টব্য]
আত্মাই একমাত্র আছেন, আর কিছু নাই
['আত্মা সর্বভূতে' দ্রষ্টব্য]

আধ্যাত্মিক পথে ধীরে ধীরে সত্যের উপর অনুরাগ ও নিষ্ঠা হয়
['সাধনপথে সত্যানুরাগ, লোভ ক্রোধাদির প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]
আনন্দ ১৯
['সৎ চিৎ আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
['অখণ্ড আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
আনন্দ ও নিরানন্দের বাহিরে এক স্থিতি
['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]
আনন্দ রূ সংসার ['সংসার ও আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
আবরণ দূর হইলেই নিত্যবস্তুর প্রকাশ
['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
আবরণ নষ্ট করিবার জন্য কর্মের প্রয়োজন
['সমাধি' দ্রষ্টব্য]

'আমি' 'আমার' জাতীয় মমতাবোধক কিছু প্রকাশ হইলে সাধকের শরীরে জ্বালা যন্ত্রণা।
['সাধনপথে সত্যানুরাগ, লোভ-ক্রোধাদির প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]
'আমিই সব' বা 'তুমিই সব' ; অবশেষে দুইই এক
['ব্রহ্মানুভূতি দ্রষ্টব্য]
আশল জিনিস জ্ঞান-অজ্ঞানের বাহিরে
['জ্ঞান ও অজ্ঞান' দ্রষ্টব্য]
আশল দর্শন ['খাঁটি দর্শনের সাধনা' দ্রষ্টব্য]
আশল দর্শনে দর্শন-আদর্শনের প্রশ্ন নাই
[খাঁটি দর্শনের সাধনা' দ্রষ্টব্য]
আশা ও সাধনা
['সাধনা ও আশা' দ্রষ্টব্য]
আসক্তি ত্যাগ ২১

আসক্তি ত্যাগ হয়, তাঁহার প্রতি আসক্তি বাড়াইলে
['আসক্তি ত্যাগ' দ্রষ্টব্য]
আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম সমস্তই নাম হইতে হয়
['নামের ফল' দ্রষ্টব্য]
আহার, মনের
['ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের সহজ উপায়' দ্রষ্টব্য]
ইচ্ছা বা বাসনা থাকিলে সর্বজ্ঞতা হয় না
['জীবের কি সর্বজ্ঞতা হয় ?' দ্রষ্টব্য]
ইচ্ছামত কৈয়ার করিতে পারেন কি সর্বজ্ঞ ?
['জীবের কি সর্বজ্ঞতা হয় ?' দ্রষ্টব্য]
উঁচু মাথা গর্বের ভাব, অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ করে
['প্রণামে অহংবোধ ত্যাগ' দ্রষ্টব্য]

এক অখণ্ড সত্তায় সব লয় পায়
['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]
এক এবং অনন্ত ['অদ্বৈত ও দ্বৈত' দ্রষ্টব্য]
এক এবং বহু ['অখণ্ড ও খণ্ড ব্রহ্ম' দ্রষ্টব্য]
এক হইয়াও তিনি বহু, বহু হইয়াও তিন এক
['অখণ্ড ও খণ্ড ব্রহ্ম' দ্রষ্টব্য]
একাগ্রতা না হইলে মনের সূক্ষ্মগতি হয় না
['মনের একাগ্রতায় অভীষ্ট সিদ্ধি' দ্রষ্টব্য]
কর্তা নিজেকে মনে করিলেই দুঃখ
['আত্মজনবিয়োগে শোক অনুচিত' দ্রষ্টব্য]
কর্ম, আবরণ নষ্ট করিবার জন্য কর্মের প্রয়োজন
['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
কর্ম ও পুরুষকার
['পুরুষকার ও কর্ম' দ্রষ্টব্য]

কর্ম বা চেষ্টার মধ্যে কোন সার নাই
['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]
কর্মের উপর সমাধি নির্ভর করে না
['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
কান্নাকাটি পরলোকগতের কষ্টের কারণ
['আত্মজনবিয়োগে শোক অনুচিত' দ্রষ্টব্য]
কাম, অধোগতিতে ['সংসার ও আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
কায়মনোবাক্যে নাম ['প্রার্থনা ও নিষ্ঠা' দ্রষ্টব্য]
কিছু করিলে সমাধি হয় না, কারণ যাহা হয় তাহা থাকে না ['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
'কিছু' বলিলে একটা অবস্থা বুঝায় যাহা নিত্য নয়। সমাধি হইল তাহা, যাহা নিত্য ['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
কিছুই ভাল লাগে না, কারণ খণ্ড আনন্দ তোমাদের ধরিয়া রাখিতে পারে না ['অখণ্ড আনন্দ' দ্রষ্টব্য]

কি করিলে সমাধি হয়? কিছু করিলেই সমাধি হয় না ['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
কুণ্ডলিনী শক্তি ২২
কৃপা ['নিয়তি এবং কৃপা' দ্রষ্টব্য] ২৪
কৃপা ও পুরুষকার ২৫
কৃপা বলিলে কি ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে?
['নিয়তি এবং কৃপা' দ্রষ্টব্য]
কৃষ্ণলীলা আরম্ভ হয় বেদান্ত শেষ হইলে
['কৃষ্ণলীলা' দ্রষ্টব্য]
কৃষ্ণলীলা ২৬
ক্রমদীক্ষা ['দীক্ষা ও তার প্রকারভেদ' দ্রষ্টব্য]
ক্রোধ-লোভাদি
['সাধনপথে সত্যানুরাগ, লোভ-ক্রোধাদির প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]

খণ্ড মা ['অখণ্ড ও খণ্ড মা' দ্রষ্টব্য]
খাঁটি দর্শনের লক্ষণ ২৭
খাঁটি দর্শনের সাধনা ২৮
খেয়াল ৩১
খেলা, মায়ের মধ্যে সাধনার খেলা
['মায়ের মধ্যে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]
গুরু কখনও মৃত হইতে পারেন না, সময়মতো এবং প্রয়োজনমতো নিজেকে প্রকট করেন।
['দীক্ষা ও তার প্রকারভেদ' দ্রষ্টব্য]
গুরু ব্যতীত যে ভগবানকে ডাকা যায় না এমত নহে
['গুরুর প্রয়োজনীয়তা' দ্রষ্টব্য]
গুরুতে নির্ভরতা ৩৬
গুরুদত্ত ভগবানের একটি নাম-ই বার বার লইতে হয় ['দীক্ষার তাৎপর্য দ্রষ্টব্য]

গুরুদত্ত মন্ত্রদ্বারা ভগবান্‌কে (অথবা নিজেকে) জানিবার উপায়কে বলে দীক্ষা
['দীক্ষার তাৎপর্য' দ্রষ্টব্য]
গুরুবরণে দ্বিধার প্রশ্ন
['গুরুর প্রয়োজনীয়তা' দ্রষ্টব্য]
গুরুমুখে মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া জপ ৩৭
গুরুর নিকট জাগতিক প্রার্থনা ৩৮
গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ ও কর্মদ্বারা মুক্তি ৩৯
গুরুর প্রয়োজনীয়তা ৪০
গুরু শিষ্যের সর্বসময়ের সঙ্গী ৪১
গ্রন্থিভেদ
['কুণ্ডলিনী শক্তি' দ্রষ্টব্য]
['জপের তাৎপর্য' দ্রষ্টব্য]
চরম দীক্ষা ['দীক্ষা ও তার প্রকারভেদ' দ্রষ্টব্য]

চিৎ ['সৎ চিৎ আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
চেতন মন্ত্র ['মন্ত্রচৈতন্য' দ্রষ্টব্য]
চেষ্টা বা কর্মের মধ্যে কোন সার নাই
['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]
চৈতন্য সমাধি ['সমাধি দ্রষ্টব্য ।
ছায়া, অহং সোহহং-এর ['ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের সহজ উপায়' দ্রষ্টব্য]
জপের তাৎপর্য ৪২
জল ও নদীর তরঙ্গ ['জীব ও শিব' দ্রষ্টব্য]
জলের ঘটি উপুড় করিলে নিঃশেষ হয়, কিন্তু পাউডারের কৌটা উপুড় করিলেও নিঃশেষ হয় না
['প্রকৃত নমস্কার' দ্রষ্টব্য]
জয় রাম, জয় মা ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্ যে নিত্য জয়যুক্ত তাহা যেন আমি অনুভব

করিতে পারি ['ভাগবত সাধনার মূল পথ' দ্রষ্টব্য]
জড় 'সমাধি ['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
জাগতিক জিনিসের স্বভাবই অভাব জাগাইয়া রাখা
['নামে রুচি ও আনন্দলাভ' দ্রষ্টব্য]
জাগতিক জিনিসের স্বভাবই ত্যাগ হওয়া
['আসক্তি ত্যাগ' দ্রষ্টব্য]
জাগতিক প্রার্থনা, গুরুর নিকট
['গুরুর নিকট জাগতিক প্রার্থনা' দ্রষ্টব্য]
জাগতিক বিষয়ের ভিতর দিয়াও ভগবান্‌কে লাভ করা যায় ['ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের সহজ উপায়' দ্রষ্টব্য]
জাগতিক স্নেহ ইত্যাদির মধ্যেও আনন্দ আছে, তাঁহারই ক্ষুদ্র প্রকাশ ['সংসার ও আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
জাগরণ, কুণ্ডলীনী শক্তির ['কুণ্ডলীনী শক্তি' দ্রষ্টব্য]

জীব ও শিব ['জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম দ্রষ্টব্য]
জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ৪৫
[তুলনীয়—'আত্মা সর্বভূতে']
['জীব ও শিব' দ্রষ্টব্য]
জীবের কি সর্বজ্ঞতা হয় ? ৪৬
জ্যোতি ['কুণ্ডলিনী শক্তি' দ্রষ্টব্য]
জ্ঞান ও অজ্ঞান ৪৮
জ্ঞানলাভ ['অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানলাভ' দ্রষ্টব্য]
জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে পার্থক্য শুধু পথের
['ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে : ব্রহ্মানু-ভূতিলাভের পথ' দ্রষ্টব্য]
জ্ঞানীর নেতি নেতি বিচার
['ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে : ব্রহ্মানুভূতিলাভের পথ' দ্রষ্টব্য]

জ্ঞানীর ব্রহ্ম ['ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে : ব্রহ্মানুভূতিলাভের পথ' দ্রষ্টব্য]
ঝগড়া পথেই, তাঁহাকে লাভ করিলে আর কথা থাকে না [ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে : ব্রহ্মানুভূতি-লাভের পথ' দ্রষ্টব্য]
তপস্যা মানে ত্যাগ সহ্য করা ['আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
ত্যাগ ['আসক্তি ত্যাগ' দ্রষ্টব্য]
['ত্যাগও একরূপ বন্ধন' দ্রষ্টব্য]
ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে বন্ধুত্ব
['প্রারব্ধ দমন ও পূর্ণানন্দ লাভের প্রয়াস' দ্রষ্টব্য]
ত্যাগ করা যায় না, ত্যাগ হইয়া যায়
['ত্যাগও একরূপ বন্ধন' দ্রষ্টব্য]
ত্যাগও একরূপ বন্ধন ৫৩
ত্রিগুণাতীত ['অদ্বৈত ও দ্বৈত' দ্রষ্টব্য]

দর্শন, খাঁটি ও মেকী
['খাঁটি দর্শনের সাধনা' দ্রষ্টব্য]
দীর্ঘজীবন পুণ্যের ফল ৫৪
দীনতা থাকিলে পতনের আশঙ্কা কম
['সাধনপথে অহঙ্কার অন্তরায়' দ্রষ্টব্য]
দীক্ষা কী ? ['দীক্ষার তাৎপর্য' দ্রষ্টব্য]
['দীক্ষার ফল' দ্রষ্টব্য]
দীক্ষা ও তার প্রকারভেদ ৫৫
দীক্ষা, মন্ত্র, জপ — সব-ই মায়ের নিজের ভিতর হইতে আসিল। আগন্তুক কেহ মাকে কিছু বলিয়া গেল না। মায়ের সাধনা খেলা ছাড়া কিছুই নয়
['মায়ের সাধনা' দ্রষ্টব্য]
দীক্ষার উদ্দেশ্য ['দীক্ষার ফল' দ্রষ্টব্য]
দীক্ষার তাৎপর্য ৫৮

দীক্ষার ফল ৬১
দুই থাকিলেই দূরত্ব এবং দুঃখ
['আত্মা সর্বভূতে' দ্রষ্টব্য]
দেখার শেষ ৬৩
দেবতা-স্পর্শ বিষয়ে শুচি-অশুচি বিচার ৬৪
দেবতার প্রকাশ ৬৫
দেহের গ্রন্থি জ্বলিয়া যায় বা গলিয়া যায়, জপের ফলে ['জপের তাৎপর্য' দ্রষ্টব্য]
দ্বৈত ও অদ্বৈত ['অদ্বৈত ও দ্বৈত' দ্রষ্টব্য]
ধন, মান, পদোন্নতির প্রার্থনা কি দোষণীয় ?
['ভগবান্ সর্বভূতে সর্বকারণে' দ্রষ্টব্য]
ধ্যান করা ও ধ্যান হওয়া ['নাম-প্রবণতা' দ্রষ্টব্য]
ধৈর্যশক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধকের ভিতরের তেজও বাড়িতে থাকে

['সাধনপথে সত্যানুরাগ, লোভ-ক্রোধাদির প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]
ধ্যান ['কুণ্ডলিনী শক্তি' দ্রষ্টব্য]
নদীর তরঙ্গ ও জল
['জীব ও শিব' দ্রষ্টব্য]
নাম ৬৮
নাম করা ও নাম হওয়া ['নাম প্রবণতা' দ্রষ্টব্য]
নাম করিতে করিতেই অভ্যববোধ হয়
['নাম-জপ' দ্রষ্টব্য]
নাম জপ ৬৯
নাম, জপ, ধ্যান ইত্যাদির উদ্দেশ্য—নিজের মধ্যে ভগবানকে ফুটাইয়া তোলা
['ভাগবত সাধনার মূল পথ' দ্রষ্টব্য]
নাম প্রবণতা ৭০

নাম-মাহাত্ম্য ৭১
নামে রুচি ও আনন্দলাভ ৭২
নামের প্রভাব ৭৪
নামের ফল ৭৫
নিজেকে বা ভগবানকে পাওয়া একই কথা
['অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানলাভ দ্রষ্টব্য]
['দীক্ষার তাৎপর্য' দ্রষ্টব্য]
নিজের করণীয় কিছুই নাই—এই বুদ্ধি আত্মসমর্পণ আনে ['পুরুষকার ও কর্ম দ্রষ্টব্য]
নিত্যবস্তুর আবরণ দূর করিবার জন্য কর্মের প্রয়োজন
['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
নিত্যবস্তুর প্রকাশ হয়, আবরণ দূর হইলে
['সমাধি দ্রষ্টব্য]
নিয়তি এবং কৃপা ৭৬

নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা ['জ্ঞান ও অজ্ঞান' দ্রষ্টব্য]
নেতি নেতি ও চিন্ময় প্রকাশ
['অদ্বৈত ও দ্বৈত দ্রষ্টব্য]
পতনের আশঙ্কা কম, দীনতা থাকিলে
['সাধনপথে অহঙ্কার অন্তরায়' দ্রষ্টব্য]
পথে যদি অহঙ্কারের তেজ না আসিয়া দীনতার ভাব সঙ্গে থাকে, তবে পতনের আশঙ্কা কম
['সাধনপথে অহঙ্কার অন্তরায়' দ্রষ্টব্য]
পথের যত ঝগড়া, তাহাকে লাভ করিলে আর কথা থাকে না ['ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে: ব্রহ্মানুভূতি লাভের পথ' দ্রষ্টব্য]
পাণ্ডিত্যের কৌটার সহিত নমস্কারের তুলনা
['প্রকৃত নমস্কার' দ্রষ্টব্য]
পুরুষকার ও কর্ম ৭৮

পুরুষকার ও কৃপা ['কৃপা ও পুরুষকার' দ্রষ্টব্য]
পুরুষকারের মহিমা ৭৯
পুরুষোত্তমের প্রকাশের জন্য যে-ক্রিয়া তাহাই ঠিক ঠিক পুরুষকার ['পুরুষকারের মহিমা' দ্রষ্টব্য]
পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ শান্তি
['নামে রুচি ও আনন্দলাভ' দ্রষ্টব্য]
পূর্ণজ্ঞান কর্মদ্বারা পাইবার নহে
[কৃপা ও পুরুষকার' দ্রষ্টব্য]
পূর্ণানন্দ মনের আহার [ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের সহজ উপায়' দ্রষ্টব্য]
প্রকাশ, দেবতার ['দেবতার প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]
প্রকৃত নমস্কার ৮০
প্রণব উচ্চারণ, মায়ের মুখে ['মায়ের প্রণব উচ্চারণ' দ্রষ্টব্য]

প্রণামে অহংবোধ ত্যাগ ৮২
প্রাণায়াম, নাম করিতে করিতে বিনা চেষ্টায় হয়
['নামের ফল' দ্রষ্টব্য]
প্রশ্নও তোমাদের, উত্তরও তোমাদের, কেবল আমার মুখ হইতে বাহির হয় মাত্র
['মায়ের বাণীর বৈশিষ্ট্য' দ্রষ্টব্য]
প্রারব্ধ কি ? ৮৩
প্রারব্ধদমন ও পূর্ণানন্দলাভের প্রয়াস ৮৪
প্রার্থনা ও নিষ্ঠা ৮৭
প্রেম, ঊর্ধ্বগতিতে ['সংসার ও আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
বন্ধুত্ব, ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে ['প্রারব্ধ দমন ও পূর্ণানন্দলাভের প্রয়াস' দ্রষ্টব্য]
বহু এবং এক ['অখণ্ড ও খণ্ড' ব্রহ্ম দ্রষ্টব্য]
বহু হইতে 'এক'-এ ফিরিয়া যাওয়াই মুক্তি। সৃষ্টি-

কর্তার সহিত এক হওয়াই মুক্তি।
['সংসার ও আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
বহুত্ব ও একত্ব
['অদ্বৈত ও দ্বৈত' দ্রষ্টব্য]
বাসনা ['অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানলাভ দ্রষ্টব্য]
বিচার ও অনুভূতি ['প্রারব্ধ কি ?' দ্রষ্টব্য]
বিভূতি ও অবিভূতির বাহিরে এক স্থিতি
['বিভূতির প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]
বিভূতির প্রকাশ ৯
বিষয় প্রার্থনা করিলে ভগবান্ বিষয়ই দিবেন। কিন্তু বিষয় বিষ। উহার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাও আসে।
['ভগবান্ সর্বভূতে, সর্বকারণে' দ্রষ্টব্য]
বৃথা ব্যথা, সব কথাই (হরিকথা ব্যতীত)
[হরিকথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা দ্রষ্টব্য]

বেদান্ত শেষ হইলে কৃষ্ণলীলা আরম্ভ হয়
['কৃষ্ণলীলা' দ্রষ্টব্য]
ব্রহ্ম সর্বভূতে সর্বরূপে : ব্রহ্মানুভূতিলাভের পথ ৯১
ব্রহ্মানুভূতি ৯৮
ব্রহ্মের স্বরূপ ['সচ্চিদানন্দ' দ্রষ্টব্য]
ব্রহ্মোপলব্ধি জ্ঞান-অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে ১০০
ভক্ত ও জ্ঞানী এক জায়গায় আসিয়া পৌঁছে
['ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে :
ব্রহ্মানুভূতিলাভের পথ' দ্রষ্টব্য]
ভক্তের ও জ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য শুধু পথের
['ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে :
ব্রহ্মানুভূতিলাভের পথ' দ্রষ্টব্য]
ভক্তের ঠাকুর ['ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে :
ব্রহ্মানুভূতিলাভের পথ' দ্রষ্টব্য]

ভগবদ্‌কৃপা দ্বারা ভাগ্য বদলানো যায় ?
['পুরুষকারের মহিমা' দ্রষ্টব্য]
ভগবান্ ভাগ্য থেকে বড় ?
[পুরুষকারের মহিমা' দ্রষ্টব্য]
ভগবান্ সর্বভূতে, সর্বকারণে ১০১
ভগবান্‌কে ডাকিবার জন্য গুরু কি অপরিহার্য ?
['গুরুর প্রয়োজনীয়তা' দ্রষ্টব্য]
ভগবান্‌কে পাইলে সমস্তই পাওয়া যায়
['ভগবান্ সর্বভূতে, সর্বকারণে' দ্রষ্টব্য]
ভগবান্‌কে সব দিয়া দিয়ো, তোমার ভার তিনি
গ্রহণ করিবেন ['নাম-মহাত্ম্য' দ্রষ্টব্য]
ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের সহজ উপায় ১০৪
ভগবানে শুচি-অশুচি নাই ['ব্রহ্ম সর্বভূতে ও
সর্বরূপে : ব্রহ্মানুভূতিলাভের পথ' দ্রষ্টব্য]

ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসের উপায়
['অজ্ঞনতা হতে জ্ঞানলাভ' দ্রষ্টব্য]
ভগবানের একটি নাম-ই (গুরুদত্ত) বার বার লইতে হয় ['দীক্ষার তাৎপর্য' দ্রষ্টব্য]
ভগবানের কৃপা ['নিয়তি এবং কৃপা' দ্রষ্টব্য]
ভগবানের পক্ষপাতিত্ব ?
['নিয়তি ও কৃপা' দ্রষ্টব্য]
ভগবানের রাজ্যে নিয়ম আছে বটে, কিন্তু কিছুই তাঁর কাছে অসম্ভব নয়
['পুরুষকারের মহিমা' দ্রষ্টব্য]
['দীক্ষার ফল' দ্রষ্টব্য]
ভাগবত সাধনার মূল পথ ১০৭
ভাগ্য কি বদলানো যায়, ভববদ্ কৃপা দ্বারা ?
['পুরুষকারের মহিমা' দ্রষ্টব্য]

ভাগ্য থেকে ভগবান্ বড়
['পুরুষকারের মহিমা' দ্রষ্টব্য]
ভাব-সমাধি ['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে বন্ধুত্ব
['প্রারব্ধদমন ও পূর্ণানন্দলাভের প্রয়াস' দ্রষ্টব্য]
ভোগ-ত্যাগের উপরে উঠিল তাঁহাকে পাওয়া যায়
['ত্যাগও একরূপ বন্ধন' দ্রষ্টব্য]
ভোগবুদ্ধিতে সংসার করিলে, বন্ধন
['সংসার কি বন্ধন' দ্রষ্টব্য]
মধ্যম দীক্ষা
['দীক্ষা ও তাহার প্রকারভেদ দ্রষ্টব্য]
মন বড় সাধক
['ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের সহজ উপায়' দ্রষ্টব্য]

মন—বাচ্চা ['ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের সহজ উপায়' দ্রষ্টব্য]
মনের আহার ['ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের সহজ উপায়' দ্রষ্টব্য]
মনের একাগ্রতায় অভীষ্টসিদ্ধি ১১০
মনের সুখাদ্য—কীর্তন, ধ্যান, নামজপ ইত্যাদি ['নামে রুচি ও আনন্দলাভ' দ্রষ্টব্য]
মনের সূক্ষ্ম গতি হইলে মহান্ প্রকাশ সুগম হয় ['মনের একাগ্রতায় অভীষ্টসিদ্ধি' দ্রষ্টব্য]
মনের স্থিরতা আসে নামের অভ্যাসে ১১২
মন্ত্র উচ্চারণমাত্রেই যদি মন্ত্রদেবতার সহিত সাক্ষাৎকার হয় তবে সেই মন্ত্র চেতনমন্ত্র ['মন্ত্রচৈতন্য' দ্রষ্টব্য]
মন্ত্রচৈতন্য ১১৩

মন্ত্রজপের ফল ১১৪
মহালক্ষ্মী পূজা ['অভাবের রাজ্য ও স্বভাবের রাজ্য' দ্রষ্টব্য]
মহাসরস্বতী পূজা ['অভাবের রাজ্য ও স্বভাবের রাজ্য' দ্রষ্টব্য]
মা, অখণ্ড ও খণ্ড মা ['অখণ্ড ও খণ্ড মা' দ্রষ্টব্য]
মা অন্তর্যামিনী ১১৬
মা ভোগ করেন সন্তানের ব্যথা-বেদনা ১১৭
মা যাহা বলেন তাহা মিথ্যা নয়। কথা মায়ের মুখ হইতে বাহির হয় মাত্র, 'তিনি' সব বলান ['মায়ের বাণীর বৈশিষ্ট্য' দ্রষ্টব্য]
মাকে যে দেখে নাই, তাহাকেও মা দেখিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহার অভাবও দূর করিতে পারেন ['অখণ্ড ও খণ্ড মা' দ্রষ্টব্য]

মাতৃবাণী স্মৃতি-নিরপেক্ষ — 'মনে রাখিয়া কিছু বলা এ দেহের পক্ষে খাটে না। স্মৃতিটি এখানে নির্মূল'
['মায়ের ভাব ও ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ও শাস্ত্র-সম্মত' দ্রষ্টব্য]
মায়ের অবস্থা — প্রথম ও দ্বিতীয় — নাই
['মায়ের মধ্যে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ দ্রষ্টব্য]
মায়ের আসন ১১৮
['মায়ের নাম করিবার খেয়াল' দ্রষ্টব্য]
মায়ের কোল ১২০
মায়ের গুরু ১২২
মায়ের দীক্ষা ১২৩
মায়ের দেহ এখনও যাহা, ছোট বেলায়ও তাহাই ছিল — প্রথম এবং দ্বিতীয় কোনও অবস্থা নাই
['মায়ের মধ্যে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]

মায়ের নাম করিবার খেয়াল ২২৬
মায়ের প্রণব উচ্চারণ ১২৯
মায়ের বাণীর বৈশিষ্ট্য ১৩১
মায়ের ব্যবহারে অদ্বৈত অবস্থা
['অদ্বৈত ও দ্বৈত' দ্রষ্টব্য]
মায়ের ভাব ও ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ও শাস্ত্রসম্মত ১৩২
মায়ের ভালবাসা ১৩৬
মায়ের মধ্যে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ ১৩৭
মায়ের মুখের কথা "এখান হইতেই প্রথম তৈয়ার হইয়াই বলা হয় এবং উহা শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়া যায়"
['মায়ের ভাব ও ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ও শাস্ত্রসম্মত' দ্রষ্টব্য]
মায়ের সাধক সাজা
['মায়ের মধ্যে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]

মায়ের সাধনা ১৩৮
মৃত্যু চিন্তা করিতে নাই
['দীর্ঘজীবন পুণ্যের ফল' দ্রষ্টব্য]
মৃত্যুর মৃত্যু ['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
মৃত্যুর যখন মৃত্যু হয় তখনই সবকিছুর সমাধান হয় অর্থাৎ সমাধি হয় ['সমাধি' দ্রষ্টব্য]
মেকী ও খাঁটি দর্শন
['খাঁটি দর্শনের সাধনা' দ্রষ্টব্য]
যতো জীব ততো শিব ['জীব ও শিব' দ্রষ্টব্য]
যা' তা' ['অদ্বৈত ও দ্বৈত' দ্রষ্টব্য]
['জ্ঞান ও অজ্ঞান' দ্রষ্টব্য]
যে-কোনও একটা উপলক্ষ ধরিয়া অহঙ্কার নিজেকে জাহির করিতে পারে
['সাধনপথে অহঙ্কার অন্তরায়' দ্রষ্টব্য]

রাধা ['কৃষ্ণলীলা' দ্রষ্টব্য]
লক্ষ্য যদি ভগবান্ হয়, তবে যে-কোন নামে তাঁহাকে ডাকিলেই পাওয়া যাইবে
['ভাগবত সাধনার মূল পথ' দ্রষ্টব্য]
লীলা ['বিভূতির প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]
শাস্ত্র যেন ছাদে উঠিবার সিঁড়ির মতো। ছাদে উঠিলে যাহা দেখা যায়, তাহার বর্ণনা শাস্ত্রে নাই।
['সচ্চিদানন্দ' দ্রষ্টব্য]
শাস্ত্র যেন টাইম-টেবিল ১৩৯
শাস্ত্রবাক্য সাধন-রাজ্যের শেষ কথা নহে
['শাস্ত্র যেন টাইম-টেবিল' দ্রষ্টব্য]
শাস্ত্রে পরস্পরবিরোধী উপদেশ ?
['শাস্ত্র যেন টাইম-টেবিল' দ্রষ্টব্য]
শাস্ত্রে সাধন-রাজের সমস্ত কথা নাই—মাত্র

কয়েকটি অবস্থার কথা আছে
['শাস্ত্র যেন টাইম-টেবিল' দ্রষ্টব্য]
শাস্ত্রের কথা যে সাধন রাজ্যের শেষ কথা এরূপ অনুমান ভুল
['শাস্ত্র যেন টাইম-টেবিল' দ্রষ্টব্য]
শিব ও জীব ['জীব ও শিব' দ্রষ্টব্য]
শিষ্য ['গুরু শিষ্যের সর্বসময়ের সঙ্গী' দ্রষ্টব্য]
শিষ্যের সর্বসময়ের সঙ্গী গুরু
['গুরু শিষ্যের সর্বসময়ের সঙ্গী' দ্রষ্টব্য]
শুচি-অশুচি বিচার, দেবতা স্পর্শ-বিষয়ে
['দেবতা স্পর্শ-বিষয়ে শুচি-অশুচি বিচার দ্রষ্টব্য]
শুচি-অশুচি ভগবানে নাই
['ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে ঃ
ব্রহ্মানুভূতিলাভের পথ' দ্রষ্টব্য]

শুদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাস
['অভ্যাস ও শুদ্ধ সংস্কার' দ্রষ্টব্য]
সংসার ও আনন্দ ১৪১
সংসার কি বন্ধন ? ১৪৪
[সংসার ও আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
সংসারটা তাঁহারই প্রকাশ, তাঁহারই ছায়া কিন্তু পূর্ণ আনন্দ — নিত্য আনন্দ পেতে হলে ছায়া ছেড়ে কায়া ধরতে হবে [সংসার ও আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
সংসারের কাজ তাঁহার সেবা বলিয়া করিবে এবং প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় তাঁহার ধ্যানের জন্য রাখিবে। তাহা হইলে মন একাগ্র হইবে
['মনের একাগ্রতায় অভীষ্টসিদ্ধি' দ্রষ্টব্য]
সচ্চিদানন্দ ['অখণ্ড আনন্দ' দ্রষ্টব্য] ১৪৫
সৎ ['সৎ চিৎ আনন্দ' দ্রষ্টব্য]

'সাক্ষিস্বরূপ' কথাটির তিন অর্থ
['সাক্ষিস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ' দ্রষ্টব্য
সাধনপথে অহঙ্কার অন্তরায় ১৫৭
সাধনপথে সত্যানুরাগ, লোভ ক্রোধাদির ১৬০
প্রকাশ
সাধনপথে বিভূতির প্রকাশ হইতেই
হইবে ['বিভূতির প্রকাশ' দ্রষ্টব্য]
সাধনা ও আশা ১৬৭
সাধনা, খাঁটি দর্শনের
['খাঁটি দর্শনের সাধনা' দ্রষ্টব্য]
সাধনের উদ্দেশ্য — নিজের শক্তির
সীমা অনুভব করা [সাধনা ও আশা' দ্রষ্টব্য]
সাধারণ দীক্ষা
['দীক্ষা ও তাহার প্রকারভেদ' দ্রষ্টব্য]

সামগ্রিক মঙ্গলসাধন ১৬৮
সাংসারিক বাসনাপূরণের প্রার্থনা কি
করা যায় ?
[গুরুর নিকট জাগতিক প্রার্থনা' দ্রষ্টব্য]
সিদ্ধি হাতের কাছে আসে, অভাববোধ
হইলে ['নাম-জপ' দ্রষ্টব্য]
সৃষ্টি ও মুক্তি
['সংসার ও আনন্দ' দ্রষ্টব্য]
সেবাধর্মের মহাত্ম্য ১৭০
সেবাবুদ্ধিতে সংসার করিলে বন্ধন হয় না
['সংসার কি বন্ধন ?' দ্রষ্টব্য]
সোঽহং ও অহং
['ভবগানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের
সহজ উপায়' দ্রষ্টব্য]

স্বভাবের রাজ্য ও অভাবের রাজ্য
['অভাবের রাজ্য ও স্বভাবের রাজ্য' দ্রষ্টব্য]
স্বয়ংপ্রকাশ পূর্ণজ্ঞান
['কৃপা ও পুরুষকার' দ্রষ্টব্য]

হরিকথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা ১৭২

ভূমিকা

'বাঙ্ময়ী মা'-র ভূমিকা লিখিবার যোগ্যতা আমার নাই ; কিন্তু মাতৃস্মৃতিচারণের এরূপ সুযোগ আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

সাধারণতঃ কোনও গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-দান ভূমিকা-লেখকের অন্যতম কর্তব্য। এক্ষেত্রে অবশ্য গতানুগতিক ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। 'বাঙ্ময়ী মা'-র পরিচয় বাঙ্ময়ী মা — শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের এই বাণী-সঙ্কলন। এই মায়ের সঙ্গে সন্তানের আছে সহজ, সরল, প্রত্যক্ষ পরিচয়।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের লক্ষ লক্ষ নরনারীর বিশ্বাস যে, ভগবান্ বা ঈশ্বর বলিতে আমরা ধারণায় যাহা আনিতে পারি, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা তাহারই মূর্ত প্রকাশ। কিন্তু মা সহজে কাহারও কাছে ধরা দিতেন না। 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ' — মায়ের মুখের

এই আত্ম-পরিচয় সাধারণ মানুষের বোধাতীত। মায়ের সম্বন্ধে অনেকের একটা ভাসা-ভাসা ধারণা আছে যে, মা ব্রহ্ম বা ভগবতী। সে ধারণা কিন্তু তাহাদেরই নিজ নিজ বুদ্ধির ছাঁচে ঢালা, আপনাপন হৃদয়াবেগে রঞ্জিত ভাবমূর্তি-বিশেষ। 'ব্রহ্ম' বা 'ভগবতী' তাহাদের ধারণনায় শব্দমাত্র। সেই শব্দের অর্থ তাহারা জানে না। আমি তো জানিই না।

ইহলীলায় মা আমাদের সকলকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, 'ছোট্ট মেয়েটি' সাজিয়া। জীবন-নাট্টে ছোট্ট মেয়ের ভূমিকাই ছিল মায়ের প্রধান অবলম্বন। লোকালয় পরিহার করিয়া হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে আত্মসমাহিত সমাধির পথ মা অনুসরণ করেন নাই। মায়ের ছিল সহজ সমাধি। উচ্চাধিকারী ও নিম্নাধিকারী সকল প্রকার মানুষকে নিজের

শান্তিময় অঙ্কে স্থান দিয়া আনন্দময়ী মা বিশ্বের কল্যাণে বর্ষণ করিতেন অনাবিল আনন্দ।

মায়ের রচিত কোন গ্রন্থ নাই। কিন্তু মাতৃবাণী মহাবাক্যের মতো। তাহা স্বতঃস্ফূর্ত এবং শাস্ত্র-সম্মত। মাতৃবাণীর মূলে কী? শাস্ত্রপাঠ? তাহা নয়। বস্তুতঃ তথাকথিত উচ্চশিক্ষা মা লাভ করেন নাই। অথচ এই নিরক্ষরপ্রায় 'ছোট্ট মেয়েটি'-র মুখে অবিরাম বেদবাণী। বিনা শাস্ত্রপাঠে মায়ের এরূপ শাস্ত্রপারদর্শিতার মূলে কী ছিল? শাস্ত্রকথা শ্রবণ? না। একদিন সৎসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন:
—"টাইমমতো পাঠে বসা হইতেছে, কী যে শুনা হইতেছে তাহা মা গঙ্গাই জানেন। ব্যাপার কি জানো? কথা যাহা বলা হয় তাহা এখান হইতেই প্রথম তৈয়ার হইয়া বলা হয় এবং উহা শাস্ত্রের

কথার সঙ্গে মিলিয়া যায়। শাস্ত্রের কথা মনে রাখিয়া উহাকে আবৃত্তি করা হয় না।" উপস্থিত জনৈক সৎসঙ্গী মন্তব্য করিলেন — "মা! তোমার কথায় ইহাই বুঝিলাম যে, তোমার ভিতর হইতে যাহা-কিছু বাহির হইয়াছে, উহা সমস্তই তোমার ভিতর নূতন সৃষ্ট হইয়া বাহির হইয়াছে।"

মা: "হাঁ মনে রাখিয়া কিছু বলা এ দেহের সম্বন্ধে খাটে না। স্মৃতিটি এখানে নির্মূল। লোকে এই অবস্থা ধারণা করিতে পারে না। পূর্বজন্মের সংস্কার অনুসারে এরূপ কথা বলা হইতে পারে এতোদূর পর্যন্ত কেহ কেহ যাইতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু কিছুই বাহির হইতে শিক্ষা করিয়া বলা হয় না — ইহা ধারণা করা খুবই শক্ত।" 'বাঙ্ময়ী মা'-র বরাভয়-বাণী এই :—

"এই শরীরটাকে তোমরা মন থেকে সরাইতে চাইতে পার। কিন্তু এ শরীর কোনদিন সরে নি, সরে না, সরবেও না। যে এই শরীরটাকে একবার ভালবেসেছে সে শত চেষ্টা করলেও এই শরীরের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারবে না। এই শরীর চিরদিন তার স্মৃতিতে আছে — থাকবেও।"

মায়ের মুখের 'এই শরীর' বলিতে আমরা নিজ নিজ আধার ও অধিকার ভেদে যাহা বুঝি, তাহারই প্রতীক 'বাঙ্ময়ী মা'।

ত্রিগুণা সেন

[ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেব্‌ল্ সোসাইটি ; ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ; ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী]

প্রকাশকের নিবেদন

"বাঙ্ময়ী মা" গ্রন্থমালা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের বাঙ্ময়ী মূর্তি বা প্রতীক। এই সঙ্কলনমূলক প্রকাশনের প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৩৯০ বঙ্গাব্দ। অল্পকালের মধ্যে প্রথম সংস্করন প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আশা আছে যে দ্বিতীয় মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইতিমধ্যে "বাঙ্ময়ী মা"-র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই গ্রন্থমালা প্রকাশনের মূলে রহিয়াছে মাতৃচরণাশ্রিত অগণিত ভ্রাতা ভগিনীর একান্ত উৎসাহ ও আন্তরিক উদ্যম।

"বাঙ্ময়ী মা" দ্বিতীয় খণ্ডের অবলম্বন — শ্রীশ্রী মায়ের কৃপাধন্য স্বর্গত অধ্যাপক অমূল্য কুমার দত্তগুপ্তের দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ মাতৃবাণী। ঢাকা, নবদ্বীপ, বারানসী ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘকাল

মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাঁহার দিনলিপিতে সমকালীন মাতৃবাণী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আর্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী, জ্ঞানী ইত্যাদি বহুপ্রকার অসংখ্য নরনারী দেশ-বিদেশ হইতে মায়ের নিকট আসিতেন। মাতৃ সৎসঙ্গে অনেকেই নিজ নিজ আধার ও অধিকার অনুসারে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ চাহিতেন কৌতূহল বা সংশয়ের সমাধান, কেহ অজ্ঞতার অবসান, কেহ বা পথের নির্দেশ। উচ্চনীচ নির্বিশেষে সৎসঙ্গীগণের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক তুচ্ছ প্রশ্নও মায়ের দৃষ্টিতে অপাংক্তেয় ছিল না। মায়ের তত্ত্বঘন আনন্দ-স্বরূপটি লীলার বিলাসে প্রকাশিত হইয়াছিল যুগোপযোগী সহজ সরল বাংলা ভাষায়।

মাতৃ সৎসঙ্গে বহু লীলা পার্ষদের প্রশ্নের উত্তরে মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সনাতন বেদবাণীর নব-ব্যঞ্জনা। সেই ভাগ্যবান প্রশ্নকর্তাগণের মধ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল অমূল্যকুমারের। তিনি মাকে "বাজাইতে" জানিতেন। মায়েরই কথার মাধ্যমে মাকে ফুটাইয়া তুলিয়া এই লিপিলেখক সযত্নে নিজেকে আড়ালে রাখিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজের দিনলিপি অবলম্বনে অমূল্যকুমার দুই খণ্ডে সমাপ্ত "শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবর্তী-কালে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটি কর্তৃক ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। অমূল্যকুমারের দিনপঞ্জীর যে অংশ গ্রন্থাকারের প্রকাশিত হয় নাই, তাহা ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে 'আনন্দ বার্তা'য় ক্রমশঃ প্রকাশিত

হইতেছে, সম্পূর্ণ হইতে আরও সময় লাগিবে।

"বাঙ্ময়ী মা"-র দ্বিতীয় খণ্ড অমূল্যকুমারের বিপুলা দিনলিপি হইতে নির্বাচিত মাতৃবাণী। এই গ্রন্থের পুরোভাগে সূচীপত্র এবং বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট একই সঙ্গে সন্নিবেশিত। মূল বিষয়ানুযায়ী প্রত্যেক প্রসঙ্গের একটি শিরোনামা আছে এবং ঐ শিরোনামা প্রকাশক কর্তৃক নির্বাচিত। প্রসঙ্গের নির্দেশক যে একমাত্র সেই নির্বাচিত শিরোনামাটিই, এরূপ নহে; তাহার নামকরণ ভিন্নভাবেও হইতে পারে। 'আত্মা সর্বভূতে' — এই শিরোনামার তাৎপর্যের পরিবর্তন হইত না যদি বলা হইত 'সর্বভূতে আত্মা'। কিন্তু বর্ণানুক্রমিক পর্যায় ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিত। কোনও পাঠকের যদি কখনও প্রশ্ন জাগে — 'সর্বভূত' সম্বন্ধে মা কি কিছু বলিয়াছেন? তবে তিনি বর্ণানুক্রমিক

নির্ঘণ্টে 'সর্বভূত' — শব্দটি ধরিয়া সন্ধান করিবেন। তাই এই গ্রন্থের সঙ্কলিত মাতৃবাণীর সন্ধান-সঙ্কেত বর্ণানুক্রমে একাধিক স্থানে দেওয়া আছে। 'আ' বর্ণের পর্যায়ে 'আত্মা সর্বভূতে'; 'স' বর্ণের পর্যায়ে 'পর্বভূতে আত্মা'।

কোনও কোনও ব্যাপক প্রসঙ্গের মধ্যে একই মূল শিরোনামায় একাধিক আনুষঙ্গিক বিষয় উল্লিখিত আছে। সে-রূপ আনুষঙ্গিক বিষয়ের স্বতন্ত্র কোনও শিরোনামা গ্রন্থমধ্যে নাই। কিন্তু প্রত্যেকটি আনুষঙ্গিক বিষয় যে' কোন্ মূল প্রসঙ্গের অন্তর্গত, তাহার সন্ধান আছে বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র-নির্ঘণ্টে।

মূল শিরোনামায় ব্যাপক প্রসঙ্গের একটি দৃষ্টান্ত :—

ব্রহ্মানুভূতি

(অমূল্য দত্তগুপ্তর দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত)

মা ঃ বিশুদ্ধভাব জাগিলেই লোকে বুঝিতে পারে চেষ্টা বা কর্মের মধ্যে কোনও সার নাই। তখন সে ভগবানের হাতের পুতুলের মতো হইয়া যায়। তিনি যেভাবে নাচান সেইভাবে সে নাচে। বিশুদ্ধভাবকে জাগাইতে হইলে একটা পথ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। সে-ভাবটা দৈতভাবেরই হউক কি অদ্বৈত-ভাবেরই হউক তাহাতে কিছু আসিয়া-যায় না। 'আমিই সব', 'আমিই সব' অথবা 'তুমিই সব', 'তুমিই সব' এইরূপ একটি ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। এইভাবে থাকিতে থাকিতে দেখা যায় সে, তখন আর দুইটি নাই — 'আমি' আছে অথবা 'তুমি' আছে। এক অখণ্ড সত্তায় তখন সব লয় পায়। ইহাই ব্রহ্মের

অনুভূতি, ইহাই ভগবান্ লাভ করা। কথাতে ইহা প্রকাশ করা যায় না। উহা বুঝিবার জন্য শুধু লাভালাভ বলা। কথার মধ্যে আসিলেই উহা খণ্ড হইয়া যায়। ভাষা তো ভাসাই। আনন্দ থাকিলেই উহার পশ্চাতে নিরানন্দ থাকিবে। ব্রহ্মানুভূতি আনন্দ ও নিরানন্দের বাহিরের এক অবস্থা। যেমন ভিজা কলসী দূর হইতে দেখিলেই তোমরা উহা জলে ভরা মনে করো ; কারণ সাধারণত জলভরা কলসীই ভিজা দেখায়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ লোকের হাবভাবে আনন্দের মতো একটা ভাব প্রকাশ পায় — কিন্তু উহা আনন্দ নহে। সে-ভাবটা যে কী তাহা ভাষার অতীত।

উপরোক্ত মূল শিরোনামা 'ব্রহ্মানুভূতি'-র অন্তর্ভুক্ত সাতটি আনুষঙ্গিক বিষয় ঃ—

(১) আনন্দ ও নিরানন্দের বাহিরে এক স্থিতি
['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]

(২) 'আমিই সব' বা 'তুমিই সব' ; অবশেষে দুই-ই এক ['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]

(৩) এক অখণ্ড সত্তায় সব লয় পায়
['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]

(৪) বিশুদ্ধভাব জাগিলে কর্মের বা চেষ্টার কোন সার নাই। ['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]

(৫) বিশুদ্ধভাব জাগাইবার পথ — অদ্বৈত ও দ্বৈত, দুই-ই। ['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]

(৬) ব্রহ্মানুভূতি বা ভগবান্ লাভ
['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]

(৭) ব্রহ্মজ্ঞের ভাব ভাষাতীত
['ব্রহ্মানুভূতি' দ্রষ্টব্য]

যে কোন একটি প্রসঙ্গ সম্বন্ধে মাতৃবাণী খুঁজিতে গেলে, এই গ্রন্থে বিভিন্নস্থানে যাহা সংগৃহীত, সহজে তাহার সন্ধান পাইবার জন্য সূচীপত্র দীর্ঘ করা হইয়াছে। —শ্রীগুণেন্দ্র নারায়ণ রায় (মিশ্র)

জনৈক ভক্ত : মা, কিছুই ভাল লাগে না।

মা : ভাল না লাগিবারই তো কথা ; কারণ তোমরা যে আনন্দেরই মূর্তি। খণ্ড আনন্দ তোমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে কেন? অখণ্ড আনন্দের আস্বাদন তোমাদের ভিতরে রহিয়া গিয়াছে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সচ্চিদানন্দের আস্বাদন আছে, এবং সংসারে সেই আনন্দের খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছ। কখনও মনে করিতেছ আনন্দ বুঝি ধনে, কখনও মানে, কখনও বা পুত্রকন্যায়—এইরূপ একটা না একটা ধারণা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছ ; কিন্তু কোন জিনিসই সেই সচ্চিদানন্দের আনন্দ তোমাদিগকে দিতেছে না। তাই শান্তি পাও না, কিছুই স্থায়িভাবে ভাল লাগে না।

অখণ্ড ও খণ্ড ব্রহ্ম

মা : ব্রহ্ম খণ্ড ও অখণ্ডে যুগপৎ আছেন। খণ্ডও তিনি, আবার অখণ্ডও তিনি। খণ্ডতেও তিনি পূর্ণভাবে আছেন, আবার অখণ্ডতেও তিনি পূর্ণভাবে আছেন। যেমন, আঙ্গুল স্পর্শ করিলেও আমাকে স্পর্শ করা হয়, অথচ আমি আঙ্গুল নহি ; আমার কাপড় স্পর্শ করিলেও আমাকে স্পর্শ করা হইল, অথচ আমি কাপড় নহি। আমার অংশ যেমন আমি, আবার সমগ্র আমিও আমি।

এক হইয়াও তিনি বহু এবং বহু হইয়াও তিনি এক। ইহাই তাঁহার লীলা।

একটি বালুকা-কণাতেও তিনি যেভাবে পূর্ণ, মানুষের মধ্যেও সেইভাবে পূর্ণ ; আবার অখণ্ডতেও সেইভাবে পূর্ণ। তাই বলি, খণ্ডতেও তিনি, অখণ্ডতেও তিনি ; তিনি যুগপৎ উভয়ই।

অখণ্ড ও খণ্ড মা

প্রশ্ন : মা, তুমি যখন অখণ্ডভাবে থাকো, তখন কি আমাদিগকে দেখিতে পাও ?

মা : দেখ্, এ-সব কথা আমি সকলের কাছে প্রকাশ করি না।

তুমি যে খণ্ডভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি খণ্ড নহি। তুমি যে অখণ্ডভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি অখণ্ড নহি ; আমি অসীমও নহি, সীমার মধ্যে বদ্ধও নহি। আমি যুগপৎ উভয়ই। আমাকে যদি খণ্ড বলো, তবে আমাকে সীমার মধ্যে বদ্ধ করা হয়। আবার আমাকে যদি অখণ্ড বলো, তাহা হইলেও আমাকে বদ্ধ করা হয়! কিন্তু আমার সীমা নাই, বন্ধন নাই ; আবার সমস্ত বন্ধনই আছে।

আমি খাইতেছি, ঘুমাইতেছি, এগুলি আমার খণ্ডভাব, কাজেই আমি সসীম ; আবার আহার-নিদ্রার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। কাজেই আমি সীমাশূন্য।

ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও আমি।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, আমি অখণ্ডভাবে তোমাদিগকে দেখিতে পাই কি-না। আমি বলি, তোমরা কেন, যে আমাকে কখনও দেখে নাই, শুনে নাই, তাহার প্রয়োজন হইলে তাহাকেও আমি দেখিতে পারি, তাহার অভাবও দূর করিয়া থাকি।

অজ্ঞানতা হতে জ্ঞানলাভ

প্রশ্ন : সাধারণ মানুষ ভগবানের অস্তিত্বে কি করে বিশ্বাস করতে পারে ?

মা : সাধুসঙ্গ করা, সদ্‌বাণী শোনা, শাস্ত্র পাঠ করা, ঠাকুরের বাণী মানা। তুমি তো অমৃতের সন্তান। অমৃত স্বয়ংপ্রকাশ—সাধুসঙ্গে ধরা দেন।

যে যা কাজ করে বিশ্বাসের উপর করে। ভগবৎ-পথের যাত্রীর সঙ্গ করলে বিশ্বাসের আগুন ভাল করে জ্বলে। বালকেরা পড়াশুনা করে এই বিশ্বাসের উপর যে আর সকলের মত পাশ করবে। সেইরকম অন্য সাধক, ভক্ত, যোগীদের দেখে বিশ্বাস করে পথ চলো।

তুমি তো আশলে জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। সেই আশল স্বরূপ প্রকাশের জন্য অজ্ঞানের আবরণ সরানো দরকার। আবরণ সরাবার

জন্য দীক্ষা, পাঠ, সাধন, ভজন ইত্যাদির দরকার। গুরু যে সাধনপন্থা বলে দেন তা পালন করতে করতে ভগবান্‌কে ধরা যায়। সবই যে ভগবানের বিগ্রহ তা বোঝা যায়। সেখানে আমি-তুমির প্রশ্ন নেই।

শান্তিরূপে, ভ্রান্তিরূপে তুমিই। তুমিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। সেইরূপ প্রকাশ হবার জন্য আবরণ সরানো দরকার। একমাত্র যে তিনিই আছেন তা বোঝাবার জন্য সাধনা, গুরুবাক্য, পালন করা ইত্যাদি দরকার। ভগবান্ তো দূরে না, বাবা। দূরে মানে দূর-বুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি। তিনি বাইরে, ভিতরে, সর্বত্র অনন্তরূপে। প্রকৃতপক্ষে আবার তিনিই তুমি। তুমি তাঁকে পাবে, মানে, তোমাকে পাবে, অর্থাৎ নিজেকে

জানবে। জিজ্ঞাসা এইজন্য আসছে যে, তোমার মধ্যে সেই জ্ঞানস্বরূপ আছেনই। তাঁকে প্রকাশ করা। লেখাপড়া শিখে যেমন তোমার ভিতরের জ্ঞানকে প্রকাশ করেছো, তেমনি সাধনার দ্বারা নিজেকে বা ভগবান্‌কে পাওয়া একই কথা। সদ্‌গুরু যা বলেন সেই আদেশ একাগ্রভাবে পালন করা তাঁকে লাভের জন্য, নিজেকে জানার জন্য। সেই পন্থা অতি সহজ, আবার অতি কঠিন। বাসনা যার যতটা নাশ হয়েছে, তার কাছে ততটা সহজ।

তুমি রাস্তায় চলতে চাইলে তিনি হাত ধরে চালাবেন। তিনি তো হাত ধরে আছেনই, এই বিশ্বাস নিয়ে চলা,—বাস্। তুমি এখন অজ্ঞানরূপ নিজেকে বোধ করছো। রাস্তায় চলা শেষ হলে

আবার নিজেকে জ্ঞানরূপে নিজে বুঝবে, কেননা তুমিই তো জ্ঞানরূপে এবং অজ্ঞানরূপে, উভয় রূপে আছো। অজ্ঞান আবরণ সরাও, জ্ঞান প্রকাশ পাবে। এই শরীরের সব এলোমেলো কথা, বাবা—এখন ধরে নাও।

অদ্বৈত ও দ্বৈত

প্রশ্নকর্তা : আপনি যখন আমাদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করেন, যেমন কাহাকেও বলেন, "তুমি কেমন আছ?" আবার কাহাকেও বলেন, "তোমার ছেলে কেমন আছে?" তখন আপনি কী অবস্থায় থাকিয়া এ ব্যবহার করেন? অদ্বৈত অবস্থায় তো এ-সব ব্যবহার হইতে পারে না; কারণ, তখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। তাহা হইলে কি আপনি অদ্বৈত

অবস্থা হইতে নীচে নামিয়া এইসব কথা বলেন, না অন্য কোন অবস্থায় থাকিয়া ইহা বলেন?

মা : (হাসিয়া) আমি যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করি, ইহা বলে কে?

প্রশ্নকর্তা : কেন? আমরাই তাহা দেখিতে পাই।

মা : এই যে দেখার কথা বলিলে, দেখা কিন্তু মন দিয়া হয়। যেখানে মন সেইখানেই মানিয়া নেওয়া। কাজেই দেখার মধ্যে মন থাকে। আর কি থাকে? না, অহঙ্কার অর্থাৎ অহং-এর ক্রিয়া থাকে।

ক্রিয়া থাকিলেই যে মানে, যাহা মানে এবং মানা এই তিনটি থাকে, যেখানে এই তিনটি থাকে সেখানে সত্যদর্শন কোথায়? সেইজন্য বলা হয় যে তিনকে ছাড়াইয়া যাইতে হইবে—ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে।

গুণের মধ্যে থাকিয়া এগুলি ধরা বড় শক্ত। এক আছে যে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি : ন অস্তি, অর্থাৎ দ্বিতীয় কিছু নাই। আবার ইহাও হইতে পারে যে, যাহা-কিছু দেখা যাইতেছে উহা ঠাকুরেরই বিভিন্ন রূপ। যাহাকে বলা হইল, "তোমার ছেলে কেমন আছে?" সে-ই বা কে? তাহার ছেলেই বা কে? সবই তো ঠাকুরের রূপ। আর বলাটাই বা কি? এও তো সেইই। কাজেই, এখানেও দ্বিতীয় বলিয়া কিছু নাই।

তোমরা বলিতে পারো যে, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছ। তোমরা দেখা-না-দেখার মধ্যে আছো কি-না, তাই এরূপ হইতেছে। কিন্তু যিনি ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া বলিতেছ তাঁহার কাছে কিন্তু দ্বিতীয় কিছু নাই।

মা : অদ্বৈত সাধনায় লোকে নেতি নেতি করিয়া আরম্ভ করে। ইহা তিনি না; ইহা তিনি না বলিয়া জগতের সমস্ত বস্তুকে একদিকে সরাইয়া দিতে দিতে যখন তাঁহার প্রকাশ হয় তখন জগতের নানাত্ব বা বহুত্ব পুড়িয়ে গিয়া এক সত্ত্বারই প্রকাশ হয়। এই অবস্থায় এক ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু থাকে না। এইজন্য বলা হয় যে, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। আবার, সাধনায় যেখান হইতে আরম্ভ করা, সেইখানেই ফিরিয়া আসা আছে। তাহা কেমন? না,

অজ্ঞান অবস্থায় যেগুলিকে নেতি নেতি বলিয়া, সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাদেরই আবার চিন্ময় দেহে প্রকাশ হওয়া। চিন্ময় দেহ কি? না, চৈতন্যময় দেহ, অর্থাৎ জগতে যাহাকিছু দেখা যায় তাহাই তাঁহার বিভিন্ন রূপের প্রকাশ

বলিয়া জ্ঞান হওয়া! এখানে যে বহুত্ব দেখা যায় উহা বহুত্ব নয়, একত্বই।

জাগতিকভাবে যেরূপ জগতের সমস্ত জিনিসকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় ইহা তাহা নয়, এগুলি অপ্রাকৃত কি-না, তাই এখানে পর পর, আলাদা আলাদা ভাব নাই এবং সমস্তই চৈতন্যময় বলিয়া ইহাদিগকে জাগতিক দেখার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কেবল তাহাই নহে।

এখানে একের মধ্যে অনন্ত এবং অনন্তের মধ্যে একত্বও উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা-কিছু আছে তাহা সমস্তই যেমন নিজের মধ্যে দেখা যায়। আবার নিজেকেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছুর মধ্যে দেখা যায়।

কাজেই এ অবস্থায় কিছু বাদ দিবার নাই; দ্বৈত

বলো, অদ্বৈত বলো, লীলা বলো, সব-কিছু এখানে পাওয়া যায়। ইহাই পূর্ণত্ব। এ অবস্থায় কিছু আছে বলিলে আছে, নাই বলিলে নাই। আবার, এখানে আছে-নাই-এর কোন প্রশ্নই নাই।

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় যে, যা আছে তা-ই আছে, অথবা যা তা।

অভাবের রাজ্য ও স্বভাবের রাজ্য

মা: আজকাল মায়েরা লক্ষ্মীপূজা করে। উদ্দেশ্য যেন খুব টাকা পয়সা হয়। তোমরা সরস্বতী-পূজা করো, যেন তোমাদের বিদ্যা হয় এবং টাকাপয়সা রোজগার করিয়া সুখে সংসার করিতে পারো। কিন্তু আমি বলি, এভাবে পূজা করিয়া লাভ নাই। কারণ এ-সব ধন ও বিদ্যা চিরস্থায়ী নয়। এ পূজা অভাবেরই পূজা।

পূজা করিতে হইলে লক্ষ্মীর পূজা না করিয়া মহালক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। তাহাতে যে ধন লাভ হয় তাহার ক্ষয় নাই। সেইরূপ সরস্বতী-পূজা না করিয়া মহাসরস্বতীর পূজা করিতে হয়, যাহাতে আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইতে পারে।

তাহা হইলেই আমরা অভাবের রাজ্য হইতে স্বভাবের রাজ্যে পৌঁছিতে পারিব। এই স্বভাবের রাজ্যে পৌঁছিতে হইলে নিজেকে যন্ত্র করিতে হইবে। তখন বুঝা যায় যে, জগতে কেবল একমাত্র তিনিই আছেন এবং তিনিই সব করিতেছেন।

অভ্যাস ও শুদ্ধ সংস্কার

প্রশ্ন : আমরা অনেক কাজ করিতে চাই না, কিন্তু অনেক সময় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন অবশ

হইয়া এই-সব কাজ করিয়া ফেলি। ইহার প্রতিকারের উপায় কি ?

মা : 'প্যারালিসিস্' জীবের স্বভাব। লোকে যখন যাহা কিছু করে তাহা অবশ হইয়াই করে। দেখো, চোখে ছোট একটু বালুকণা গেলেও আমরা চোখে দেখিতে পারি না। সমস্ত চোখ জলে ভরিয়ে ওঠে। সেইরূপ বিষেয়ের সামান্য সংস্পর্শ থাকিলেই মন চঞ্চল হইয়া ওঠে। আমাদের মনে কত জন্ম-জন্মান্তরের বিষয়ের ছাপ রহিয়াছে। উহা কি সহজে চলিয়া যাইবে ? ঐ-সব সংস্কার বশতঃই আমরা অবশ হইয়া কাজ করিয়া ফেলি। সেইজন্য অভ্যাস করিতে হয়। এই অভ্যাসের ফলে অন্যদিকেও তো 'প্যারালিসিস্' হইতে পারে। জাগতিক কাজ, যেমন পূর্ব পূর্ব সংস্কারের জন্য আমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে

অবশ হইয়া করিয়া ফেলি, আধ্যাত্মিক কাজও কেন অভ্যাসের ফলে আপনা আপনি হইয়া যাইবে না!

আত্মজনবিয়োগে শোক অনুচিত

মা ঃ (কন্যা শোককাতর পিতার প্রতি) দেখ, নিজেকে কর্তা মনে করিয়াই যত দুঃখ বরণ করিয়া নিয়াছ। যদি 'আমার ছেলে' আমার মেয়ে' এই ভাবটা না থাকিত, যদি স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদিকে ভগবানের ধন বলিয়া মনে করিতে পারিতে, তবে কষ্টের কোন কারণই থাকিত না। যার ধন তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিয়া আমরা কখনও দুঃখিত হই না, বরং দায় হইতে মুক্ত হইলাম মনে করিয়া শান্তিলাভ করি। যদি সত্যই তুমি তোমার

মেয়েকে ভালবাসো তবে তাহার জন্য কান্নাকাটি করিয়ো না, বরং যাহাতে তাহার সদ্‌গতি হয় সেজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিও। যখনই তুমি তোমার কন্যার জন্য কান্নাকাটি করিবে তখনই সে তোমার নিকট আসিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সে তো আসিতে পারিবে না, কারণ যে পর্দা দ্বারা সে তোমা হইতে এখন পৃথক্ হইয়া আছে তাহা ছিড়িবার সাধ্য তাহার নাই। সেরূপ চেষ্টা কেবল তাহাকে কষ্টই দিবে।

তুমি মেয়ের জন্য কান্নাকাটি করিয়া কেবল তাহার বেশী কষ্টের কারণই হইবে।

ইহাকে তো ভালোবাসা বলে না। তাই তাহার কল্যাণের জন্য, শান্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো।

মা ঃ যেখানে দুই থাকে সেইখানেই দূরত্ব এবং দুঃখ।

এই দূরত্ব দূর করিবার জন্যই তো যত চেষ্টা। সেখানে একমাত্র তিনিই আছেন, আর কিছু নাই, সেখানে দুঃখ, ভয় আসিবে কোথা হইতে? পূর্বেও অনেকবার বলা হইয়াছে যে,

> একমাত্র আত্মাই আছেন আর কিছু নাই। এরূপ অনুভব না হইলে পূর্ণ ও অংশের জ্ঞান হয় না।

প্রভু এবং দাসের জ্ঞান হয় না। পরমাত্মারূপে যিনি পূর্ণ, অংশরূপেও তিনি প্রভু এবং দাসরূপেও তিনি। এক পরমাত্মার জ্ঞান হইলেই এ-সব বুঝা যায়। তখনই বলা যায় যে, সর্বরূপে সর্বভাবে একমাত্র তিনিই আছেন। মায়ের কোলে উঠিয়াই মায়ের

দোল খাইতে হয় এবং উহা যে মায়েরই দোল তাহা বুঝা যায়।

['জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম' দ্রষ্টব্য]

আনন্দ

মা ঃ জীবের মধ্যে একটি জিনিস আছে যাহাকে আমরা বলি আনন্দ। জীব স্বভাবতঃই আনন্দ চায়। তাহার ভিতর এই আনন্দ আছে বলিয়াই তো সে উহা চাহিতে পারে। তাহা না হইলে সে উহা চাহিতে না। সে আনন্দ না চাহিয়া থাকিতে পারে না। লক্ষ্য করিলে এই আনন্দ ও শান্তির আকাঙ্খা সমস্ত জীবের মধ্যেই দেখিতে পাইবে। পোকা-মাকড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীও তাপের দিকে যাইতে চায় না। তাহারা চায় শান্তি ও আরাম। রৌদ্রে তাপিত

হইয়া জীবজন্তু চায় ছায়া। মানুষও সেইরূপ ত্রিতাপ-জ্বালায় তাপিত হইয়া শান্তির স্থল, আনন্দের আকর ভগবানকে খোঁজ করে।

ত্রিতাপ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে অন্য তাপের সাহায্য নিতে হয়। তাপ দিয়াই তাপকে জয় করিতে হয়। একেই বলে তপস্যা। তাপ সহ্য করাকে আমি তপস্যা বলি।

সংসারে তাপ ভোগ করাতে যেরূপ কষ্ট, প্রথম প্রথম ভগবানের নাম নেওয়াতেও সেইরূপ কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হইলেও এই কষ্ট দিয়াই ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কাজেই চাই চেষ্টা, চাই কর্ম।

['সৎ চিৎ আনন্দ' ও 'অখণ্ড আনন্দ' দ্রষ্টব্য]

মা ঃ চেষ্টা করিয়া আসক্তি ত্যাগ করা যায় না, কেবল তাঁহাকে পাইবার আসক্তি বাড়াইলেই অন্য আসক্তি ত্যাগ হইয়া যায়। ত্যাগের জন্য ব্যস্ততা কি? জাগতিক জিনিসের স্বভাবই ত্যাগ হওয়া।

আনন্দ আর শান্তি সকলেরই লক্ষ্য ; উহা সকলের মধ্যেই আছে। উহার তো আর ত্যাগ হইবে না। যাহা ত্যাগ হইবার তাহা ত্যাগ হইয়া যাইবে।

মা : যখন কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয় তখন নাভিমূলে যে-সব গ্রন্থি আছে তাহা খুলিতে আরম্ভ করে। এই-সব গ্রন্থি-ভেদ হইলেই নানারূপ শব্দ শুনা যায় ও জ্যোতিঃ দেখা যায়।

কোন গ্রন্থি-ভেদ হইলে অনাহত ধ্বনি শুনা যায়। ইহা সর্বদাই হইতেছে; কিন্তু চিত্ত স্থির না হইলে উহা শুনা যায় না। ইহা জগতের যাবতীয় ধ্বনির সমষ্টি। যেমন শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর ইত্যাদির শব্দ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এগুলি একত্র বাজাইলে সব শব্দ একত্র মিলিয়া ভিন্ন একরকম শব্দ হয়, অনাহত ধ্বনিও ঐরূপ। জগতের এমন কোন ধ্বনি নাই যাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে; অথচ জগতের সমস্ত ধ্বনিই ইহা হইতে উৎপন্ন। সেইরূপ আবার অন্য

এক গ্রন্থি-ভেদ হইলে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। এ জ্যোতিও অপার্থিব। জগতের কোন আলোর সঙ্গেই ইহার তুলনা হয় না।

রূপ সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। গ্রন্থি-ভেদের সঙ্গে সঙ্গেই লোকের সংস্কার অনুসারে নানারূপ দর্শন হয়। আবার, সমস্ত রূপ এক রূপে লয় হইয়া যায়।

জগতের সমস্ত জিনিসই এক মূল হইতে উৎপন্ন।

গ্রন্থি-ভেদ হইলেই এ-সব বুঝিতে পারা যায়। যাহার সমস্ত গ্রন্থি-ভেদ হইয়াছে কেবল সে-ই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ বুঝিতে পারে। যাহার মাত্র আংশিক ভেদ হইয়াছে সে সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে পারে না।

কৃপা

মা ঃ কৃপা হইল পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল। উহা তো তোমার প্রাপ্য বটেই ; কিন্তু তুমি তো তাহা জানো না, তাই উহাকে কৃপা বলিয়া মনে করো। তাহা ছাড়া, সাধক সাধন করিতে করিতে এমন একটি অবস্থা লাভ করে যে তখন সমস্তই তাহার নিকট কৃপা বলিয়া মনে হয়। জগতে যাহা কিছু হইতেছে তাহা যেন ভগবানের কৃপাতেই হইতেছে ; উহাতে সাধ্য-সাধন কিছুই নাই ; ইহাই কৃপার অবস্থা। ইহার পর যে অবস্থা আসে তাহাতে কৃপা নাই ! তখন মাত্র এক সত্তাই থাকে। কে কাহাকে কৃপা করিবে ?

["নিয়তি এবং কৃপা" দ্রষ্টব্য]

কৃপা ও পুরুষকার

মা ঃ কৃপা এবং পুরুষকার এই-সব কথা যে হয় ইহা কেবল এক জিনিসকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা। কথা বলিতে গেলেই এক একটা দিক লইয়া কথা বলিতে হয়। এক দিক হইতে দেখিলে সমস্তই তাঁহার কৃপা বলিয়া মনে হয়। আমরা যে ভগবান্‌কে পাইতে চেষ্টা করিতেছি ইহাও তাঁহারই কৃপা। তাহার কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে চাহিবার উপায় নাই। পুরুষকারের অভাবে আমরা যে তাঁহাকে পাইতেছি না ইহাও তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন। আবার, অন্য দিক হইতে দেখিলে কৃপা বলিয়া কোন কথাই নাই সমস্তই পুরুষকার হইতে হয়। জগতে যদি মাত্র একটি সত্তাই থাকে তবে কে কাহাকে কৃপা করিবে ? এইভাবে কৃপা ও পুরুষকার লইয়া ঝগড়া চিরকালই থাকিয়া যাইবে। কেহ কৃপাকে বড় বলিবে,

কেহ পুরুষকারকে বড় বলিবে। যতদিন সমদৃষ্টি বা সমবুদ্ধি না হইবে ততদিন এই বিবাদের অবসান নাই। পূর্ণজ্ঞান হইলেই এই দ্বন্দ্বের শেষ হয়। তবে একটা কথা এই যে, কর্ম করিলে কর্মফল থাকিবেই। আবার, কর্মেরও শেষ নাই। সেই হিসাবে সাধনা অনন্ত। কিন্তু

পূর্ণজ্ঞান বা অখণ্ডজ্ঞান কর্মদ্বারা পাইবার নয়।

উহা স্বয়ংপ্রকাশ।

কৃষ্ণলীলা

মা: কৃষ্ণলীলা জীবনমুক্ত পুরুষগণও শুনিবার অধিকারী নহেন; কারণ, 'মুক্ত' বলিলে বুঝা যায় যে, এককালে ইহারা বদ্ধ ছিলেন এবং পরে মুক্ত

হইয়াছেন। ইহারও উর্দ্ধলোকে যাঁহারা আছেন কেবল তাঁহারাই কৃষ্ণলীলা শুনিতে ও বুঝিতে পারেন।

বেদান্ত শেষ হইলে কৃষ্ণলীলা আরম্ভ হয়। ইহা ভাষায় প্রকাশ করা চলে না।

এ লীলার পুরুষ মাত্র একজন। তিনিই রাধা, তিনিই যোগিণী এবং তিনিই রাখালবালকগণ। এক কৃষ্ণই নানাভাবে নিজেকে সম্ভোগ করিতেছেন।

খাঁটি দর্শনের লক্ষণ

মা: কোন্‌টি খাঁটি দর্শন তাহা বুঝিবার উপায় এই যে, ঐ-সব দর্শনের ফলে তুমি কতখানি বদলাইয়া যাইতেছ তাহা লক্ষ্য করা। দর্শনের ফলে যদি

তুমি দেখিতে পাও যে তোমার মন ক্রমেই ভগবানের দিকে যাইতেছে এবং বিষয়ের দিকে তাহার যে গতিটা ছিল তাহা ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে, তখনই বুঝিবে যে তোমার দর্শনটা ঠিক ঠিকই হইতেছে। কারণ, তিনি নানারূপে দর্শন দেন কি-না, তাই মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়।

খাঁটি দর্শনের সাধনা

প্রশ্ন : মা, সাধনপথে যে-সব দর্শনাদি হয় ঐ দর্শনগুলির কোন্‌টা খাঁটি এবং কোন্‌টা মেকী তাহা বুঝিব কি করিয়া?

মা : দর্শন স্বপ্নেও হয়, আবার সাধন অবস্থায়ও হয়। কেহ হয়তো দেবতা দেখিল, কি মন্দির

দেখিল, কি কৃষ্ণ বা শিব দেখিল। স্বপ্নে জাগতিক বিষয় যাহা দেখা যায় তাহা হইতে এই দর্শনগুলি আলাদা বলিয়া ইহা যে দেখে তাহার আনন্দ হয়। যদি গুরু কিংবা ইষ্টমূর্তির দর্শন পায় তবে আনন্দ আরও বেশী হয় এবং সে মনে করিতে থাকে যে এতদিন সে জপাদি যাহা করিয়াছে তাহার ফলস্বরূপ গুরু কৃপা করিয়া তাহাকে দর্শন দিয়াছেন। গুরু বা ইষ্ট না দেখিয়া যদি সে অন্যান্য দেবদেবীও দেখে তাহা হইলেও উঁহারা যে তাহার ইষ্টরই বিভিন্ন রূপ ইহা মনে করিয়াও আনন্দ পায়। অনেক সময় এমনও হয় যে, কিসের দর্শন হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া মনে নাই, তবুও আনন্দের একটা ভাব আছে। ক্রিয়ামাত্রই মনের উপর একটা ছাপ রাখিয়া যায় তো। এই দাগগুলি খুব স্পষ্ট না যইতেও পারে;

কিন্তু দাগ যে থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং যে উহা দেখিতে পারে সে অবশ্য বুঝিতে পারে যে কখন কিভাবে ঐ দাগ পড়িয়াছে। যাহা হউক, দেবতাদি দর্শন হইলে মনের উপর একটা চিহ্ন পড়ে। যদি এইরূপ দর্শন প্রায়ই হইতে থাকে তবে ঐ চিহ্ন বড় হইতে হইতে ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগের একটা পথের মত হইয়া দাঁড়ায়। আবার এমন দর্শনও আছে যাহা দেখামাত্র সাধককে বদলাইয়া দিয়া যায়। ঐ দর্শনের কথা সে আর ভুলিতে পারে না। যেমন, ক্ষুধার কথা কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হয় না, উহা সময়মত আপনি জাগিয়া উঠে, সেইরূপ ঐ যে দর্শনের কথা বলিলাম তাহাও জপের সময় আপনি জাগিয়া উঠে। এইসব দর্শনের মধ্যে কোন্‌টা আগে এবং কোন্‌টা পরে হইবে তাহা কিন্তু কিছু বলিতেছি

না। দর্শনের রকমটা যে ভিন্ন ভিন্ন হয় শুধু তাহাই বলিতেছি।

তবে আশল দর্শন হইল সেই দর্শন যাহার ফলে দর্শন-অদর্শনের কোন প্রশ্নই থাকে না। উহা তৎস্বরূপ হইয়া যাওয়া কি-না। তাই ওখানে দর্শন-অদর্শনের কোন প্রশ্নই নাই।

খেয়াল

প্রশ্ন : মা, তুমি যে খেয়াল শব্দটি ব্যবহার করো উহার অর্থ কি ?

মা : (হাসিয়া) তোমরা ইহার যাহা অর্থ করো।

প্রশ্ন : আমরা খেয়ালটা দুই অর্থেই ব্যবহার করি—খেয়াল বলিতে ইচ্ছা বুঝায় আবার স্মৃতিও বুঝায়, কিন্তু এই দুই অর্থই তোমার বেলায় অচল।

মা : (হাসিয়া) তোমরা বলো না এ খেয়ালী ? ঐ ভাবেই খেয়াল শব্দটি ধরিয়া লইতে পারো। যখন উহা বলা হয় তখন তোমরা উহার সম্বন্ধে তো একটা ধারণা করিয়া লওই।

প্রশ্ন : আমাদের জাগতিক ব্যাপারে এমন কিছু কি নাই যাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া আমরা ঐ খেয়াল সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে পারি ?

মা : হ্যাঁ, পাগলের কাজকর্মের সহিত এই খেয়ালের তুলনা করিতে পারো। আর এ দেহের মাথাটা তো খারাপই।

প্রশ্ন : পাগলের কাজের সহিত তোমার খেয়ালের তুলনা চলে না, কারণ তোমাকে অনেক সময় খেয়াল করাইয়া দিতে হয়। পাগলকে তো কিছু খেয়াল করাইয়া দিতে হয় না। তারপর পাগল

খেয়ালবশে অপকর্মও করিয়া ফেলে, কিন্তু তোমার কোন কর্মকেই অপকর্ম বলা যায় না। খেয়ালের অর্থ এখনও বুঝিতে পারিলাম না।

মা : (হাসিয়া) দেখো, খেয়াল বলিতে ইচ্ছা বুঝায় না। কারণ ইচ্ছা বলিলে অনিচ্ছা থাকে, একটা অভাব বোধ থাকে। আবার ইচ্ছার সহিত আগ্রহও থাকে। কিন্তু যখন খেয়াল বলা হয় তখন উহার আগ্রহ অনাগ্রহে কিছুই নাই।

জনৈক ভক্ত : আমি খেয়াল অর্থে এই বুঝি যে ইহা পরম সত্তার একটা তরঙ্গ বিশেষ যাহা রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু মা তো দুই রকম খেয়ালের কথা বলেন যেমন পাকা খেয়াল ও কাঁচা খেয়াল।

মা : (হাসিয়া) হাঁ, দুই রকম খেয়ালই হয়।

যখন পাকা খেয়াল হয় তখন যাহা হইবে বলিয়া খেয়াল হয় তাহা হইতে বাধ্য। উহা রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। আবার অনেক সময় খেয়ালটাকে তোমাদের ইচ্ছার সঙ্গে মিলাইয়া দেই। তখন উহা ঐরূপই হইয়া যায়। ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে সে সম্বন্ধে তো এ দেহ হইতে কথা সকল সময় বাহির হয় না। অনেক সময় ব্যবহারটা কতকটা এইরূপ হয়—যেমন কেহ একটা কাজের জন্য এলাহাবাদে যাইতে চাহিতেছে। আমি দেখিতেছি যে এলাহাবাদে গেলে তাহার কাজ কিছুই হইবে না এবং তাহার ঐখানে যাওয়াটা বৃথাই হইবে। কিন্তু সে যখন এলাহাবাদে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন আমিও বলি, "হ্যাঁ, এলাহাবাদে গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারো।" এলাহাবাদে গিয়া কিন্তু

সে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। তাহাকে যদি প্রথমেই এলাহাবাদে যাইতে নিষেধ করিতাম তবে আমার কথায় এলাহাবাদে না গেলেও তাহার মনের কোণে কিন্তু এই চিন্তাটাই গজগজ করিতে থাকিত যে যদি সে যাইত তবে হয়তো বা তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইত। কিন্তু এলাহাবাদে গিয়া সে যখন বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল তখন সে একেবারে নিশ্চিন্ত। কাজেই অনেক সময় এ দেহের খেয়ালটা তোমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার সহিত যুক্ত হইয়া কাজ করে, আবার যখন পাকা খেয়াল হয় তখন তো উহা অব্যর্থভাবে হইয়াই যায়।

প্রশ্ন: আচ্ছা, এই খেয়ালটাকে কি আমরা লীলা বলিতে পারি?

মা: তোমরা সব কিছুই বলিতে পারো,

গুরুর নিকট জাগতিক প্রার্থনা

প্রশ্ন : মা, সাংসারিক বাসনা পুরণের জন্য গুরুর নিকট কি প্রার্থনা করা যায় না ?

মা : কেন করিবে না ? প্রার্থনা করিতে হইলে তো গুরুর নিকটেই করিবে। গুরু ছাড়া আর কে আছে ?

তবে গুরু যদি এসব প্রার্থনা পছন্দ না করেন, তিনি নিজেই উহা কমাইয়া দিবেন। তুমি হাত-পা ছুঁড়িতে থাকিবে, গুরুর যদি ইচ্ছা হয় তবে তিনি তোমাক শান্ত করিয়া দিবেন।

গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ ও কর্মদ্বারা মুক্তি

প্রশ্ন : মা, কেহ যদি গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া জপ-তপাদি না করে তবে কি সে কোন-দিনই মুক্ত হইতে পারে না ?

মা : পুরুষকার চাই। দেখ না পাথরের মধ্যে আগুন আছে, কিন্তু না ঘষিলে আগুন দেখা যায় না। কর্ম থাকিতে গুরুশক্তি বুঝা যায় না। তাই কর্ম শেষ করিবার জন্য পুরুষকারের দরকার। কর্ম করিয়াই কর্ম শেষ করিতে হয়।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন ঃ যদি শান্তি, মুক্তি নাম হইতেই হয় তবে গুরুর কোন প্রয়োজন নাই ?

মা ঃ বেশ বাবা, তুমি যদি মনে করো যে গুরু না লইলে তোমার চলে, তাহাতে দোষ কি ? তুমি এমনিই নাম করো তাহাতেই হইবে। জগতে কোন জিনিসই বৃথা যায় না। এই যে গাছের একটি পাতা পড়িতেছে, ইহাও বৃথা নয়। তুমি লক্ষ্য করো আর না করো, ইহাও তোমার উপর ছাপ রাখিয়া যাইতেছে। হয়তো সময়মত ইহা আবার জাগিয়া উঠিবে। তাই নাম করিলে ফল পাইবেই। মানুষ উপলক্ষ ভিন্ন চলিতে পারে না বলিয়া গুরুর দরকার। তবে

গুরু ব্যতীত যে ভগবান্‌কে ডাকা যায় না এমত নহে।

গুরু শিষ্যের সর্বসময়ের সঙ্গী

প্রশ্ন ঃ কি অর্থে গুরুদেব আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন ?

মা ঃ অনেক অর্থেই ঐ কথা বলা যায়। প্রথমতঃ বিষয়টি অখণ্ডভাবে দেখ। গুরু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণু ব্যাপিয়া আছেন। এই অর্থে তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আবার, বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, জগতে এক সৎ বস্তু আছে। তিনিই গুরু, আবার তিনিই শিষ্য। গুরু-শিষ্যে কোন ভেদ নাই। এই অর্থে গুরু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তা ছাড়া, গুরু মন্ত্ররূপেও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তারপর বিষয়টি খণ্ডভাবে দেখিলে দেখা যায় যোগীরা যোগবলে একই সময় বহু জায়গায় থাকিতে পারেন। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য গুরু যোগবলে খণ্ডভাবে সমস্ত শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা থাকিতে পারেন। এভাবে ধরিলেও কথাটি সত্য।

মা ঃ আবার যে বলা হয় যে মন্ত্রার্থ ধারণা করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হয়, তাহাও হইতে পারে। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে, জপ করা এবং রঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রার্থ চিন্তা করা বড় কঠিন হইয়া উঠে। এ সময় করিতে হয় কি, না মন্ত্রের যাহা অর্থ তাহা প্রথমে চিন্তা করিয়া নিয়া উহাই যে পূর্ণভাবে যন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান আছে এইরূপ ধারণা লইয়া জপ করিতে হয়। মন্ত্রকেই গুরুর বা ইস্টের মূর্তি জ্ঞান করিয়া উহা জপ করিয়া যাইতে হয়। জপ না করিয়া শুধু মন্ত্র শুনিয়া গেলে যেমন শুনার দিকটা খুলিয়া যায়, সেইরূপ জপ করিলে জপের ফলে পা হইতে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। জপের ফলে শরীরে এইরূপ ঝঙ্কার হওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন যে গ্রন্থির মধ্যে মন্ত্রটি

নিবদ্ধ আছে সেই গ্রন্থির উপর আঘাত পড়ে। কাঠে কাঠে ঘষিলে যেমন কাঠ হইতে আগুন বাহির হয়, এ খানে খুঁড়িতে খুঁড়িতে যেমন সেই স্থান হইতে জল বাহির হয়, সেইরূপ

জপ করিতে করিতে দেহের যে সব গ্রন্থি আছে তাহা খুলিয়া যায়। জপের ফলে এইসব গ্রন্থি হয় জ্বলিয়া যায়, না হয় গলিয়া যায়।

জীব ও শিব

মা ঃ জীব তো স্বরূপতঃ ভগবান্। শুধু বন্ধনের জন্য তাহাকে জীব বলা হয়। বন্ধনটি খুলিয়া গেলে সে যে ভগবান, সেই ভগবান্ই থাকে। সেইজন্য আবার বলা হয় যে,

যত জীব তত শিব। এই জীবভাবকে নদীর তরঙ্গের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। নদীর জলে ঢেউ ওঠে। এই ঢেউগুলি জীব, আর জল হইল ভগবান্। ঢেউ কিন্তু জলে উঠে এবং প্রকৃতপক্ষে উহা জল বই আর কিছু নয়।

সেইরূপ জীবের স্থিতি ভগবানে এবং প্রকৃতপক্ষে সে ভগবান্ই। তবে আমাদের ভেদবুদ্ধি আছে বলিয়া ঢেউকে জল হইতে আলাদা ভাবি। তাহা না হইলে ঢেউ ও জলের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। আমাদের অজ্ঞান কেবল প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে।

['জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম' দ্রষ্টব্য]

মা ঃ সাধারণভাবে দেখিলেও মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যেও একত্ব, অসীমত্ব ও অব্যক্ত ভাব আছে। আমরা পাঁচ মিনিট কি চিন্তা করিলাম তাহার সব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। কি কি চিন্তা করিলাম তাহার অনেক কথাই অবশ্য বলিতে পারি, কিন্তু সব পারি না। ইহাতেই মনের অসীমত্ব প্রকাশ পায়। আবার এই অসীমত্বের মধ্যেও একত্ব আছে। যেমন, আমরা একটা একটা করিয়া কথা বলি, এক অক্ষর এক অক্ষর করিয়া লিখি, এক পা এক পা করিয়া হাঁটি, এক গ্রাস এক গ্রাস করিয়া খাই, এইগুলি একত্বের লক্ষণ। আবার দেখ, আমাদের মধ্যে অব্যক্ত ভাবও আছে। আমরা বলি যে, ফুলটি সুন্দর। কিন্তু কেমন সুন্দর তাহা ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারি না।

হয়তো উহা প্রকাশ করিতে যাইয়া অনেক কথাই বলি, কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ ভাবটা প্রকাশ হয় না। কিছু অব্যক্ত থাকিয়াই যায়। কাজেই জীবের মধ্যে ব্রহ্মের সমস্ত লক্ষণ আছে। তাই জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম।

[তুলনীয় 'আত্মা সর্বভূতে' ঃ
'জীব ও শিব' দ্রষ্টব্য]

জীবের কি সর্বজ্ঞতা হয় ?

প্রশ্ন ঃ মনুষ্যদেহে সর্বজ্ঞতা লাভ হয়—কি না ?

মা ঃ হ্যাঁ হয়। কিন্তু তাহার বাহিরে প্রকাশ নাই। এই সর্বজ্ঞতা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। তোমরা অনেক সময় বল না যে, খালি চোখে ইহা দেখা যায় না, চশমা ছাড়া দেখিতে পাইবে না।

ইহাও সেইরূপ। বিশেষ দৃষ্টি খুলিয়া না গেলে এই সর্বজ্ঞতা ধরা যায় না। যিনি সর্বজ্ঞ, লোকে তাহাকে সাধারণ দেহধারী বলিয়াই মনে করে ; কিন্তু এই সাধারণ দেহের মধ্যেই সর্বজ্ঞতা। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। তোমরা বল না যে, এক বালুকণার মধ্যেও ব্রহ্ম পূর্ণভাবে রহিয়াছেন। ইহাও সেইরূপ।

প্রশ্ন ঃ এই সর্বজ্ঞতা কিরূপ ? ইহা কি পূর্ণ সর্বজ্ঞতা ?

মা ঃ হ্যাঁ পূর্ণ সর্বজ্ঞতা।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, যিনি সর্বজ্ঞ তিনি কি একটি ইঞ্জিন তৈয়ার করিতে জানেন ?

মা ঃ সব জানা বলিলে কি সমস্ত-কিছুই বুঝায় না ?

প্রশ্ন ঃ তাহা হইলে
যিনি সর্বজ্ঞ তিনি ইচ্ছা করিলে একটি ইঞ্জিনও তৈয়ার করিতে পারেন।

আছেন, ভগবান্ ভিন্ন আর যাহা আছে তাহা সমস্তই অসৎ, তখন তোমরা জ্ঞানের কথাই বলো। এই জ্ঞান দ্বৈত হইতে পারে, আবার অদ্বৈতও হইতে পারে। দ্বৈত এবং অদ্বৈত বলিয়া যাহা বলা হয় তাহা একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন জল আর বরফ। জলের মধ্যে বরফের একটা রূপ থাকে বলিয়াই জল জমিয়া বরফ হয়! তাহা না হইলে নিরাকার জল কখনো সাকার হইতে পারিত না। আবার, বরফের মধ্যে জল থাকে বলিয়াই বরফ গলিয়া জল হয়। সেইরূপ লীলার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকিলেও উহা স্বরূপতঃ একই বস্তু। এইজন্য বলা হয় বিগ্রহ। বিগ্রহ কি? না, বিশেষ রূপ গ্রহণ। কিন্তু জ্ঞানের দিক হইতে বলিতে গেলে বলা যায় যে তিনিই তাঁহাকে লইয়া

খেলিতেছেন। আবার, জ্ঞানের প্রকাশটা এমনও হইতে পারে যখন উহাকে ভাষার সাহায্যে আর পরিচয় দেওয়া যায় না। জাগতিক হিসাবেও তোমরা দেখিতে পাও যে, রসগোল্লার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তোমরা উহার কতটুকু বা প্রকাশ করিতে পারো? কিছুটা অব্যক্ত থাকিয়া যায়। সেইরূপ একমাত্র ভগবান্ই আছেন বা তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলিলেও যেন তাঁহার সমগ্র পরিচয়টা দেওয়া হইল না বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ,

যে অবস্থাটা বাক্য-মনের অগোচর বলিয়া বলা হয়, যে অবস্থায় সবই আছে আবার কিছুই নাই, অথবা 'আছে' বা নাই-এর কোন প্রশ্নই নাই, যে অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া আমি অনেক সময় যা' তা' বলি, অথবা নিজেকে ফিরিয়ে পাওয়া বলি। ইহাকেই

জ্ঞান-অজ্ঞানের বাহিরের অবস্থা বলা যাইতে পারে। জ্ঞানের অবস্থাটাকে তোমরা কখনও দ্বৈত জ্ঞান, কখনও অদ্বৈত জ্ঞান, কখনও বা বিশিষ্টাদ্বৈত জ্ঞান ইত্যাদি বলিয়া উহার পরিচয় দেও। কিন্তু যাহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা যায় তাহা ভাষা দ্বারা বুঝানো যায় না। এই অবস্থায় পেঁৗছিলে বুঝা যায় যে, যে যে-অবস্থায় দাঁড়াইয়া যাহা বলিতেছে, ঐ অবস্থায় তাহার পক্ষে ঐরূপ বলাই স্বাভাবিক।

এই অবস্থায় কোন-কিছুর সহিতই দ্বন্দ্ব থাকে না। ইহাই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় যে ইহা জ্ঞান-অজ্ঞানের বাহিরে।

ত্যাগ ও একরূপ বন্ধন

মা ঃ ত্যাগেরও কিন্তু একটা আনন্দ আছে। ভোগের যেরূপ আনন্দ ত্যাগেও সেইরূপ। লোকে যে সাধন-ভজন করিতে আসিয়া ত্যাগের কঠোরতা সহ্য করে ইহাতে আনন্দ পায় বলিয়াই তো করে।

প্রশ্ন ঃ মা, তুমি পূর্বে একদিন বলিয়াছিলে যে ত্যাগ বলিয়া কিছু নাই, লোকে খণ্ড ভোগ হইতে পরিপূর্ণ ভোগের দিকে চলিতেছে।

মা ঃ এখনও সেই কথা একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি।

লোকে বলে না যে, ভোগই বন্ধন সৃষ্টি করে। আমি বলি যে, ত্যাগ ও বন্ধন সৃষ্টি করে। যে ত্যাগে আনন্দ পাওয়া যায় উহাও একরূপ বন্ধন, উহার মধ্যেও অহঙ্কার লুকাইয়া আছে।

বাঙ্ময়ী মা

আমি এতটা ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, ইহা মনে করিয়াই যেন আনন্দ লাভ করে। সেই জন্যই বলা হয় যে,

> ত্যাগ করা যায় না — ত্যাগ হইয়া যায়। তাঁহাকে পাইতে হইলে ভোগ-ত্যাগের উপরে উঠিতে হয়।

দীর্ঘজীবন পুণ্যের ফল

মা ঃ দীর্ঘজীবন-লাভ পুণ্যের ফলে হয়। যত বেশী বাঁচিয়া থাকা যায় তত ভোগ কাটিয়া যায়।

> মৃত্যু চিন্তা করিতে নাই, বরং ভাবিতে হয় আমার ভোগ কটিয়া যাইতেছে।

দীক্ষা ও তার প্রকারভেদ

মা ঃ দীক্ষাও অনেক রকমের হয়।

> এক রকম দীক্ষা আছে যেখানে দীক্ষামাত্রই শিষ্যের আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়। এই দীক্ষা-প্রাপ্তি মাত্র শিষ্যের যে পঞ্চভূতের দেহ আছে উহা পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় এবং সে একেবারে স্বরূপে স্থিতিলাভ করে। ইহাকেই ম দীক্ষাচর বলে।
>
> মহাপুরুষ বা সদ্‌গুরু হইতে যে দীক্ষা হয় তাহাকে মধ্যম দীক্ষা বলা চলে।

এখানে গুরু নিজ শক্তি মন্ত্রে দিয়া উহা শিষ্যকে দান করেন। ঐ দিক্ষার ফলে শিষ্য ধীরে ধীরে সংস্কারমুক্ত হইয়া পরে স্বরূপে স্থিত হয়। এইরূপে সংস্কারমুক্ত হইতে কিছু সময় লাগে। কেহ কেহ বলেন যে, অন্ততঃ তিন জন্মের মধ্যে শিষ্য মুক্ত হয়। সদ্‌গুরুর

এই মন্ত্রশক্তি শিষ্য উপলব্ধি করিতে না পারিলেও উহা কাজ করিতেছে। সেইজন্য বলা হয় যে, সদ্‌গুরুর আশ্রিত শিষ্য কোন কাজ করুক বা না করুক তাহাতে তাহার উন্নতির কোন ব্যাঘাত হয় না। তবে মন্ত্র পাইয়া সে যদি তপ-জপ করে তবে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি উপলব্ধি করিতে পারে।

আর এক রকম দীক্ষা আছে বাহাকে সাধারণ দীক্ষা বলা যাইতে পারে, যেমন কুলগুরুর দীক্ষা।

এখানে কুলগুরুর তো এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে উহা মন্ত্রের সঙ্গে যোগ করিয়া দিবে। কিন্তু তবুও প্রত্যেক মন্ত্রেরই একটা নিজস্ব শক্তি আছে। কারণ, প্রত্যেক মন্ত্রই সিদ্ধ। কোন না কোন সময়ে এই মন্ত্র জপ করিয়া কেহ না কেহ সিদ্ধ হইয়াছেন। কাজেই

মন্ত্রের এই অন্তর্নিহিত শক্তি শিষ্যকে চালিত করিতে থাকে। তবে ইহার গতি খুব ধীর।

ইহা ছাড়া বার বার দীক্ষারও ব্যবস্থা আছে। যেমন, গুরু এক মন্ত্র দিলেন, উহা জপ করিয়া শিষ্য একটু উন্নত হইলে পরে তাহাকে আরও উন্নত করিবার জন্য আবার অন্য মন্ত্র দিলেন। এইরূপ

চরম দীক্ষা পাইবার পূর্বে বহুবার দীক্ষা হইতে পারে। এই যে ক্রমদীক্ষা ইহা শিষ্যের ভিতর কালক্রমে স্বতঃই স্ফুরিত হইতে পারে।

অর্থাৎ গুরু যে প্রথম দীক্ষা দিলেন উহাই শিষ্যকে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে লইয়া যাইতে যাহা দরকার তাহা সময় মত শিষ্যের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। আবার এমনও হয় যে, গুরু নিজে প্রকট হইয়া শিষ্যকে বার বার দীক্ষা দিয়া তাহাকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া

যাইতে পারেন। গুরু দেহে নাই বলিয়া যে ক্রমদীক্ষার কোন ব্যাঘাত হয় তাহা নহে। কারণ,

গুরু কখনো মৃত হইতে পারেন না। সময়মত এবং প্রয়োজনমত সর্বদাই তিনি নিজকে প্রকট করেন।

দীক্ষার তাৎপর্য

মা: নিজেকে জানিবার উপায় বা পথকেই দীক্ষা বলে। নিজেকে জানাই হইল ভগবানকে জানা। যাহাতে আমরা নিজেকে জানিতে পারি সেইজন্য ভগবান্ কৃপা করিয়া গুরুরূপে আমাদিগকে পথ বলিয়া দেন। তিনি মন্ত্র বা শক্তি দিয়া আমাদের স্বরূপ জানিবার উপায় করিয়া দেন। ইহাই দীক্ষা।

জনৈক ভক্ত: গুরু একটি মন্ত্র বা নাম দিলেন, আমাকে তাহাই বার বার জপ করিতে হইবে। এরূপ করিব কেন? ভগবানের তো অনেক নাম আছে, উহার যখন যেটা আমার ভাল লাগবে তখন তাহা লইলে কি ফলিবে না?

মা: এক নামই তো বার বার লইতে হয়। ইহা কেমন জানো?

তোমরা শরীর পুষ্টির জন্য নানা জিনিস খাও। রোজই নূতন তরকারী দিয়া ভাত খাও। ডাল তরকারী ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ভাত কিন্তু রোজই এক থাকে। তাহা না হইলে শরীর পুষ্ট হয় না। শুধু তরকারী খাইলে চলে না। সেইরূপ ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং জপ থাকিলেও সকল রূপ এবং সকল নাম সকলের জন্য নয়। যেমন, তোমার চশমা অন্যের চোখে লাগে না

বা অন্যের চশমা তোমার চোখে লাগে না। সেইরূপ প্রত্যেকের ভগবান্‌ই আলাদা আলাদা। অবশ্য যখন কাহারও পূর্ণতা লাভ হয় তখন সকলের ভগবান্‌ই তাহার ভগবান্ হইয়া যায়। কিন্তু পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্বে প্রত্যেকের ভগবান্ আলাদা আলাদা থাকে এবং গুরু যাহা দিয়াছেন তাহা লইয়াই চলিতে হয়।

ভক্ত : এই-সব ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং মূর্তি হইতেই সম্প্রদায় এবং ঝগড়ার সৃষ্টি হয়; যেমন শৈব এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে ঝগড়া।

মা : আমি সে জাতীয় কোন কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি যে, যাহারা এক শিবের উপাসনা করে তাহাদের ভগবানও এক নয় প্রত্যেকের শিব আলাদা আলাদা তুমি যে শিবকে ডাকো আর

একজন কিন্তু সেই শিবকে ডাকে না। এইরূপ কালী এবং বিষ্ণু। এক বিষ্ণুর মধ্যেই অনন্ত বিষ্ণু, এক কালীর মধ্যেই অনন্ত কালী। সেইজন্য

যাহাকে যে মন্ত্র দিলে মুক্তি হইতে পারে গুরু তাহা বলিয়া দেন। গুরু — যাঁর যন্ত্রে কোন পার্থক্য নাই। গুরুর যেমন নাক, কান, মুখ দেখিতে পাও, মন্ত্রের মধ্যে তাহাই দেখিতে পাইবে। বাস্তবিক মন্ত্রগুলি গুরুর নাক, কান, মুখ। উহা লইয়া কাজ করিলেই সময়ে ভগবান্ বা নিজেকে জানিতে পারিবে।

দীক্ষার ফল

মা : দীক্ষার উদ্দেশ্য হইল শিষ্যকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া।

একবার যদি যোগ হইয়া যায় উহার যে ফল তাহা তো ফলিবেই। তবে, অনেক সময় দীক্ষার ফল বাহিরে প্রকাশ হইতে দেখা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বলা যায় না যে কোন ফল হইতেছে না। এক সময় হয়তো হঠাৎ ঐ ফলটা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সেইজন্য বলা হয় যে, কখন কাহার ভিতর ভগবানের প্রকাশ হইবে তাহা বলা যায় না।

প্রশ্ন ঃ ভিতরে যদি কাহারও পরিবর্তন হইতে থাকে তবে উহার কিছুই কি বাহিরে প্রকাশ হইবে না ?

মা ঃ অনেক সময় পরিবর্তনগুলি বাহির হইতে ধরা যায়, আবার অনেক সময় ধরা যায়ও না।

তোমরা হয়তো এক দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতেছ যে, তাহার এই বিষয়ে কোন পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু অন্য দিকে হয়তো তাহার পরিবর্তন

হইতে পারে, যে পরিবর্তনের দিকে তোমাদের দৃষ্টি পড়িতেছে না।

প্রশ্ন ঃ পরিবর্তন হইলে সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন হওয়াই উচিত। আংশিকভাবে কি কোন পরিবর্তন হয় ?

মা ঃ হ্যাঁ, তাহাও হয়। ধরো না, একটি আমগাছের একটি ডালের আমগুলি পাকিয়া গেল, কিন্তু অন্যান্য ডালের আমগুলি কাঁচাই রহিল, এরূপ তো তোমরা দেখিতে পাও। তাই ভগবানের রাজ্যে সবই সম্ভব। গুরু যাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন তাহাকে তিনি কিভাবে লইয়া যাইবেন তাহা তিনিই জানেন।

দেখার শেষ

মা ঃ সেই দেখাই তো দেখা যাহা দেখিলে দেখিবার সাধ চিরদিনের মত একেবারে চলিয়া যায়।

দেবতা-স্পর্শ বিষয়ে শুচি-অশুচি বিচার

প্রশ্ন : মা, দেবতা স্পর্শ করিতে শুচি-অশুচি বিচার কি ? মায়ের কাছে যাইব, মাকে স্পর্শ করিব, এতে শুচি-অশুচি বিচার আসিবে কেন ? আমার মা আমাকে এ-সব বিচার করিতে বলেন, কিন্তু উহার আমি কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাই না।

মা : যদি দেবতাকে স্পর্শ করিতে যাইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া মনে হয় তবে অবশ্য বিচারবুদ্ধি আসে না। কিন্তু এ অবস্থা হয় ক'জনের ? তাই শাস্ত্রের কথা মানিয়া চলিতে হয়। তোমার যদি সত্যি সত্যি সেই অবস্থা হইয়া থাকে যাহাতে দেবতাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে মা বলিয়া ভাবিতে পারো ; তবে বিচার করিও না। তাহা না হইলে বিচার করিতেই হইবে।

মা : কোন দেবতার পূজার সময় মুদ্রা ইত্যাদি যাহা কিছু করার বিধি শাস্ত্রে আছে উহা যখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনি হইয়া যায় ; কাহারও কথা শুনিয়া বা কাহারও দেখিয়া ঐরূপ করিলে চলিবে না। উহা যখন নিজ হইতেই হইয়া যাইবে, তখনই দেবতার প্রকাশ হইবে এবং তুমি যে ঐ দেবতা হইতে অভিন্ন তাহাও প্রকাশ হইবে। এ-দেহের যখন সাধনের খেলা চলিতেছিল তখন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পূজার সময়ে দেহের কোন্ স্থান কিভাবে স্পর্শ করিতে হইবে এবং কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে, কখন শ্বাস বন্ধ রাখিতে হইবে এবং কখন উহা খুলিতে হইবে, আঙ্গুলগুলি কি ভঙ্গীতে রাখিতে হইবে, সবই আপনা আপনি হইয়া থাকে। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে লোকে যখন

পূজা করে তখন তাহাদিগকেও ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি। সেইজন্য বলা হয় যে, শাস্ত্রের ঐ সব বিধানে যখন নিজ ইচ্ছা বা চেষ্টা-সাপেক্ষ না হইয়া আপনা আপনি হয় তখনই দেবতার প্রকাশ হয় এবং নিজেও যে তৎস্বরূপ তাহাও প্রকাশ হয়।

প্রশ্ন ঃ যদি বিধিপূর্বক কোন দেবতার পূজা আপনা হইতেই হইয়া গেলে সেই দেবতার সহিত অভিন্নতা স্থাপন হয় তবে ঐ দেবতাতে আবদ্ধ না হইয়া উহা অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায় কিরূপে ?

মা ঃ যদি পূজাদি সাধনের লক্ষ্য মাত্র দেবতাই হয় তবে অবশ্য দেবতাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা যদি না হয়, যদি লক্ষ্যটা পূর্ণত্বের দিকে থাকে, তবে দেবতার সহিত অভিন্ন হইয়াও ঐখানেই অন্যান্য পথের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, কেহ

যদি শিব-পূজা করিয়া শিবের সহিত অভিন্ন হয়, তবে সে ঐখানে শক্তিরও সন্ধান পায় ; বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যান্য দেবতারও সন্ধান পায়। পাহাড়ে উঠিতে যদিও এক পথ দিয়া উঠিতে হয়, কিন্তু পাহাড়ে উঠিলে যেমন ঐখানে উঠিবার অন্যান্য পথেরও সন্ধান পাওয়া যায় ইহাও সেইরূপ। এক দেবতার মধ্যেই সমস্ত দেবতা পাওয়া যায় এবং সকলের সহিত নিজের অভিন্নতা বুঝা যায়। তাহার কারণ এই যে, তিনি সর্বরূপে সর্বস্থানেই পূর্ণভাবে আছেন কিনা, তাই যে-কোন স্থানে, যে-কোন দেবতায় তাঁহাকে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। এইজন্য রাধা বা হ্লাদিনী শক্তির উপাসনা করিয়া কৃষ্ণ পাওয়া যায়, কারণ হ্লাদিনী শক্তি যে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। সেই-রূপ শিব উপাসনা করিয়া শক্তি পাওয়া যায়, অর্থাৎ

যে কোন মূর্তি বা দেবতাকে পূর্ণভাবে পাইলেই সেখানে সব-কিছু পাওয়া যায়।

নাম

মা ঃ নাম করিয়া যাও। সর্বদা নাম কর, তাহাতেই সব পাইবে। শান্তি মুক্তি সবই নাম হইতেই হয়।

প্রশ্ন ঃ যদি শান্তি মুক্তি নাম হইতেই হয়, তবে গুরুর প্রয়োজন নাই ?

মা ঃ বেশ, বাবা, তুমি যদি মনে কর গুরু না লইলে তোমার চলে, তাহাতে দোষ কি ? তুমি এমনিই নাম কর, তাহাতেই হইবে। মানুষ উপলক্ষ ভিন্ন চলিতে পারে না বলিয়া গুরুর দরকার। তবে গুরু ব্যতীত যে ভগবানকে ডাকা যায় না এমত নহে।

মা ঃ সকলে সর্বদা নাম করিতে থাকো। যে দিন যায় তাহা আর আসিবে না। কিছু হইল না বলিয়া নিরাশ হইতে নাই। কারণ কিছু হইল না এই ভাবই প্রমাণ করিতেছে যে কিছু হইতেছে। চাই কেবল অভাববোধ।

> আমার নাম হইতেছে না, আমি ঠিকমত নাম করিতে পারিতেছি না, কি করিলে আমি ঠিক ঠিক নাম করিতে পারিব ? এইরূপ খুব একটা অভাব বোধ হইলেই সিদ্ধি হাতের কাছে আসিয়া পড়ে।

কিন্তু আমাদের যে অভাববোধই নাই। আমাদের ক্ষুধাই যে নাই। তোমাদের ক্ষুধা না থাকিলে তোমরা যেমন ঔষধ খাইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করো, ভগবানের নাম করাও সেইরূপ।

নাম করিতে করিতেই অভাব বোধ হয় এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য লোকে অস্থির হইয়া পড়ে।

নাম-প্রবণতা

মা ঃ যখন দেখিবে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাম আপনা-আপনি চলিতেছে, যখন দেখিবে কর্মান্তরে তোমার অন্যত্র যাওয়া দরকার, কিন্তু নাম তোমাকে যাইতে দিতেছে না।

যখন দেখিবে নাম তোমার ইচ্ছা ও কর্মের শক্তি দখল করিয়া বসিয়াছে, তখনই বুঝিবে নাম হইতেছে। সেইরূপ ধ্যান করা এক কথা এবং ধ্যান হওয়া আর এক কথা। লোকে ধ্যান করিতে চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু যখন সত্যসত্যই ধ্যান হয় তখন বুঝিতে পারে যে, এই দুইটির মধ্যে কত প্রভেদ।

নাম মাহাত্ম্য

প্রশ্ন ঃ মা, আমরা সংসারী ; আমরা যদি ভগবান্ ভগবান্ করিয়া সমস্ত সাংসারিক কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া বসি তবে আমাদের সংসার চলিবে কিরূপে ?

মা ঃ ভগবানের নামে মাতিয়া থাকার অবস্থা আসিলে সংসারের কথা আর মনে থাকে না। তোমরা তো জানো যে, চৈতন্য কি সে-বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন ? তুমি নাম করিয়া যাও, দেখিবে তোমার সমস্ত কাজ আপনা-আপনি হইবে।

ভগবান্‌কে পরীক্ষা করিবার জন্য কিছু ফেলিয়া রাখিও না ; তাহা হইলে কিন্তু কিছুই হইবে না। তাঁহাকে সব দিয়া দিয়ো, তোমার ভার তিনি বহন করিবেন।

মা ঃ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আমার দিন এমনি কাটিয়া যাইবে ; আমি ভগবানকে লাভ করিতে পারিব না, আবার আমাকে জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে—এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া নামে রুচি আনিতে হয়।

আনন্দ ও শান্তি সকলেরই লক্ষ্য। কীট পতঙ্গ সকলেই এই আনন্দ ও শান্তি চাহিতেছে। কিন্তু পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ শান্তি কোন জাগতিক পদার্থ হইতে পাইবে না।

মন যে অশান্তভাবে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে ছুটাছুটি করিতেছে, তাহাও এই আনন্দ আর শান্তি লাভ করার চেষ্টায়। আনন্দ ও শান্তি পাইবে বলিয়া ধন, মান, যশ প্রভৃতি জাগতিক জিনিসের পাছে মন ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এ-সব খণ্ড আনন্দ

তাহাকে সুখী করিতে পারিতেছে না। সে চায় পূর্ণানন্দ। মন উহা পাইতেছে না বলিয়াই চঞ্চল।

তাই বলি মনকে সুখাদ্য দাও। কীর্তন, ধ্যান, নামজপ ইত্যাদি মনের খাদ্য। ইহা মনকে দিলেই একদিন মন শান্ত হইবে। ইহা ব্যতীত আর যে কোন জাগতিক জিনিস মনকে দিবে তাহাতে মন শান্ত হইবে না। জাগতিক জিনিসের স্বভাবই অভাব জাগাইয়া রাখা।

দেখ না, একজনের ৪।৫ খানা বাড়ী হইল ; তাহাতে কিন্তু তাহার অভাব গেল না ; তখন তাহার মনে হইতে লাগিল আরও একখানা বাড়ী করিলে বুঝি ভাল হইত। আবার, কেহ যদি কয়েক হাজার টাকা সঞ্চয় করে তখন তাহার আরও বেশি সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা হয়। জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই এইরূপ

জানিবে। কেবল পরম ধন লাভ করিলে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে, অভাব চলিয়া যায়। এ ধন লোককে স্বভাবে স্থিত করে। সাধন করিতে বসিয়া নিরাশ হইতে নাই। সর্বদা নিজেকে এইভাবে উৎসাহিত করিতে হয় যে, মূর্খ ছেলেও যদি লেখাপড়া করিয়া পরম পণ্ডিত হইতে পারে, তবে আমিই বা কেন চেষ্টা করিলে ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিব না ?

নামের প্রভাব

মা ঃ "নাম নামী আর তার রূপ অভিন্ন, — যেমন অগ্নি, উত্তাপ আর তার দাহিকা শক্তি। সর্বরূপ স্বয়ং তিনিই তো। আবার, নাম নিতে নিতে চেতনা জাগ্রত হয়, যেমন বীজ বপন করলে বৃক্ষের উৎপত্তি। তাই নাম নিয়ে থাকাই তাঁকে নিয়ে থাকা। তোমাদের

মেয়ের এই ভিক্ষা তোমরা যত পারো তাঁর সঙ্গ করো তাঁর নাম করো—শুধু নাম। আমি জানি নামেই সব হয়।

নামের ফল

মা ঃ নাম করিয়া যাও, দেখিবে সমস্ত জিনিসই আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে। আমার ইহা হইয়াছে বলিয়াই আমি এত জোরের সহিত বলিতেছি।

আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম সমস্তই নাম হইতে হয়। তোমরা কি লক্ষ্য করো নাই যে, তোমরা যখন কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা করো তখন তোমাদের অজ্ঞাতসারে শ্বাস বন্ধ হইয়া যায় ? পরে হঠাৎ যখন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করো তখন বুঝিতে পারো যে, শ্বাস

বন্ধ হইয়াছিল। চিন্তার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা সম্বন্ধ আছে।

নাম করিতে করিতে এমন একটা অবস্থা আসে যখন প্রাণায়াম আপনা হইতেই হইতে থাকে। উহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না।

নিয়তি এবং কৃপা

প্রশ্ন ঃ নিয়তি বলিয়া যাহা আছে লোকে তাহা কর্ম দ্বারা পরিবর্তিত করিতে পারে কি না ?

মা ঃ ভগবানের কৃপায় সবই সম্ভব। তিনি কৃপা করিলে মুহূর্তমধ্যে কি না হইতে পারে ?

প্রশ্ন ঃ ঐ কৃপাটুকু কি নিয়তির মধ্যে নয় ?

মা ঃ তাহা যদি বলো, নিয়তির উপরে যদি যাও

তবে তো কিছুই থাকে না। যতক্ষণ ভগবান্ আছেন, আমি আছি, কর্ম আছে ইত্যাদি বলা যায়, ততক্ষণই কৃপা ও কর্মের কথা হয়। কিন্তু যখন এই দ্বৈতভাব থাকে না তখন নিয়তিও নাই, কৃপাও নাই। তখন বলা হয় যে, যাকিছু হইতেছে তাহা স্বভাব হইতেই হইতেছে।

প্রশ্ন ঃ কৃপা করিলে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে ?

মা ঃ তুমি যেভাবে থাকিয়া এ-সব কথা বলিতেছে সে অবস্থায় অবশ্য এ সব কথা সত্য। কিন্তু ভগবান্‌কে যখন জগৎ হইতে আলাদা দেখিবে না, যখন জগতে যাহা কিছু হইতেছে তাহাই ভগবানের স্বাভাবিক স্ফুরণ হইতে হইতেছে বলিয়া জানিবে, তখন কৃপা কর্ম

কিছুই থাকিবে না। সৎ-অসৎ বিচারও থাকিবে না।

পুরুষকার ও কর্ম

মা ঃ যতক্ষণ তোমাদের শক্তি আছে ততক্ষণ তোমাদের কর্ম করিতেই হইবে। সাংসারিক দশ বিষয়ে যেরূপ কর্ম করিতেছে, ধর্ম বিষয়েও সেইরূপ কর্ম করিবে। তবে ইহা মনে রাখিয়ো এখনও ধর্ম-বিষয়ে যে-সব কাজ হইতেছে উহা অজ্ঞানের কাজ এবং এ কাজও তিনি করাইয়া নিতেছেন। কিন্তু এরূপ কর্ম করিতে করিতেই লোকে নিজ শক্তির অসারতা বুঝিতে পারে।

নিজের করণীয় কিছু নাই, এই জ্ঞান হইলেই আত্মসমর্পণ হয় এবং তখন ভগবানে নির্ভর আসে।

তখনও কিন্তু কর্মের শেষ হয় না। তখন জ্ঞানের কর্ম চলিতে থাকে। তখন বুঝা যায় যে, তিনি সব করাইতেছেত ; এ অবস্থায়ও অহংজ্ঞান থাকে বলিয়া কর্ম বলিতেছি। এ অবস্থায় যে কর্ম হয় তাহাই পুরুষকার। ইহাই পরম পুরুষের কর্ম।

পুরুষকারের মহিমা

প্রশ্ন ঃ মানুষের জন্ম হয়েছে প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে। তা হলে পুরুষকারের মহত্ত্ব কি ?

মা ঃ পুরুষকারের দ্বারা পরমপুরুষকে পেতে হবে। পুরুষোত্তমের প্রকাশের জন্য যে ক্রিয়া, তা-ই হলো ঠিক ঠিক পুরুষকার। ভগবৎকৃপার দ্বারা ভাগ্যও বদলানো যায়।

যে-ভক্ত বিশ্বাস করে যে, ভগবৎকৃপায় প্রারব্ধ বদলানো যায়, তার জন্য তাও সম্ভব।

ভগবানের রাজ্যে নিয়ম আছে বটে, কিন্তু তাঁর কাছে অসম্ভব কিছুই নয়। তুমি যদি মানো যে, ভগবৎকৃপাও ভাগ্য-নির্দিষ্ট, তবে তোমার জন্যই তাই ঠিক। কিন্তু যদি ভাগ্য থেকে ভগবান্‌কে বড় বলে মানো তবে তিনি তোমার জন্য সব-কিছু করতে পারেন। তিনি ভক্তের যোগ ও ক্ষেম বহন করেন।

প্রকৃত নমস্কার

মা : নমস্কার কেমন? না, যেমন ঘটি হইতে জল ঢালা।

দেখ না, ঘটিটি যদি উপুড় করা যায় তবে উহার ভিতরের সমস্ত জলই পড়িয়া যায়। সেইরূপ, নমস্তের

পায়ে সমস্ত ভাব ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে প্রকৃত নমস্কার। তোমরাই তো বলো যে, আমাদের মস্তক সমস্ত ভাব ও চিন্তার আধার।

নমস্কার করিতে যাইয়া আমরা যখন উহা উপুড় করি তখন কিছুই তো পড়িয়া যায় না। এ যেন পাউডারের কৌটা উপুর করার মত। পাউডারের কৌটা উপুড় করিলে উহা ঢাকনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অতি সামান্য পাউডারই পড়ে, সমস্ত পাউডার পড়িয়া যায় না। ঘটিটি শূন্য না হইলে তো ভগবান্ উহা পূর্ণ করেন না।

প্রণামে অহংবোধ ত্যাগ

মা : প্রণাম করিতে যাইয়া লোকে মাথা হেঁট করে কেন? সে তখন নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারে। যাহার নিকট সে মস্তক নত করিতেছে তাহার তুলনায় সে যে কত তুচ্ছ তাহা বুঝিতে পারে। আর, যতক্ষণ অহংবুদ্ধি প্রবল থাকে ততক্ষণ ঘাড় সোজা করিয়া রাখে।

উঁচু মাথা গর্বের ভাব, অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ করে।

প্রারব্ধ কি?

মা : প্রারব্ধ কি? যাহা পরে লাভ করা হইয়াছে। তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে তাহা তোমরা জানো। এখানে তো এলোমেলো কথা, পরে যাহা লাভ করা যায় তাহাকেই আমি প্রারব্ধ বলি — অর্থাৎ, পূর্বে কর্ম করিলে, ফল পরে পাইলে। যেখানে কর্ম থাকে সেইখানেই লাভালাভ থাকে। আবার, প্রশ্ন হইতে পারে, কর্ম করে কে? কর্মও তিনি করিতেছেন, ফলভোগও তিনি করিতেছেন। এগুলি তাঁহার লীলা ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে প্রারব্ধ বলিয়া কিছু নাই। আবার, ভক্তের নিকট প্রারব্ধ নাই, কারণ সবই যে প্রিয়তমের কাজ। কর্মরূপে এবং কর্মফল-রূপে তাহার প্রিয়তমই যে নিজকে প্রকাশ করিতেছেন, সুখরূপেও তাহার প্রিয়তমের প্রকাশ, দুঃখরূপেও তাহার প্রিয়তমের প্রকাশ। এইভাবে দেখিলে সুখ

দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল বলিয়া কিছু থাকে না। অবশ্য বিচার দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। কিন্তু

বিচার মন দিয়া করা হয় বলিয়া ইহা স্থায়ী হয় না; কারণ মন চঞ্চল কিনা, তাই মন দিয়া কিছু ধরিলে তাহা স্থায়ী হয় না। কিন্তু যখন ইহা অনুভূতিতে আসে তখন বুঝা যায় যে, যা আছে তা-ই আছে। যাহা কিছু হইয়া যায় তাহাই ঠিক।

প্রারব্ধ দমন ও পূর্ণানন্দলাভের প্রয়াস

প্রশ্ন : প্রবল প্রারব্ধ দমনের উপায় কি ?

মা : এরূপ স্থলে আমি ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে বন্ধুত্ব করিতে বলি। অর্থাৎ, ভোগ যখন একেবারে ছাড়িতে পারিবে না, তখন ভোগ করিতে করিতে উহার মধ্যেই ত্যাগ অভ্যাস করা ভাল।

যেমন সপ্তাহে ছয় দিন ঘটা করিয়া খাইলে, আর একদিন শুধু ভাতেভাত হইলে। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে ভোগ বাসনা কমিয়া যায়। ইহা জানিয়ো যে, যখন মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছ তখন কিছু সুকৃতি আছেই। কিছু সুকৃতি না থাকিলে মনুষ্যজন্ম লাভ করা যায় না। মনুষ্যজন্ম হইলেই বুঝিবে যে, জীব আত্মজ্ঞানের ধারায় পড়িয়াছে। তখন ইচ্ছা করিলে সে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, আবার নীচ জন্মও লাভ করিতে পারে। কাজেই মনুষ্যজন্ম লাভ করিলে অন্ততঃ তপস্যা হিসেবেও কতক সময় জোর করিয়া ভগবানের নামে দেওয়া উচিত। ইহা সত্য যে, প্রবল প্রারব্ধ বিরুদ্ধে থাকিলে সদ্‌ভাব লইয়া বেশীদিন থাকা যায় না, মাঝে মাঝে ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে পারে। কিন্তু প্রবল প্রারব্ধের বিরুদ্ধে কিছুই হয়

না, ইহা বলা ঠিক নয়। সৎপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে তাহার একটা ছাপ মনের উপর পড়িয়া থাকে। উহাই সৎপথে চালিত করিতে চেষ্টা করে। সৎসঙ্গও এইরূপ জানিবে ; উহাও মনের উপর ছাপ রাখিয়া যায়। তোমরা যে সন্ন্যাস সন্ন্যাস বলো, উহা কিন্তু গেরুয়া পরিলে হয় না — সন্ন্যাস হইয়া যায় স্বভাবের গুণে। যেমন গাছে জল দিলে সময়ে ফুল ফল আপনিই হয়। সেইরূপ ভগবানের নাম লইয়া পড়িয়া থাকিলে সময়ে আপনা আপনি সন্ন্যাসের ভাব জাগিয়া উঠে, প্রকৃত সন্ন্যাসের ভাব জাগিয়া উঠিলে দেবতারাও প্রলোভন দিয়া সন্ন্যাসীকে ধরিয়া রাখিতে পারে না! তাই বলি, ভগবানের নাম করিয়া যাও। কিছু হয় না, ইহা সত্য নয়, জীবমাত্রই আনন্দের পুতুল ; সে খণ্ড আনন্দে তুষ্ট হইবে না। যাহাতে সে পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করো।

প্রার্থনা ও নিষ্ঠা

প্রশ্ন : মা, মনে মনে প্রার্থনা করা ভাল, না উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করা ভাল ?

মা : প্রার্থনা কায়মনোবাক্যে করিতে হয়। যদি মনই না থাকে তবে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা আসিবে কোথা হইতে ? তবে জানিয়ো, যদি ঠিক ঠিকভাবে মন দিয়া প্রার্থনা করা যায়, তবে দেহ ও বাক্য আপনা আপনি আসিয়া মিলিত হইবে। কীর্তন করিতে করিতে তোমাদের হাত আপনা আপনিই উঠিয়া যায়। ইহাতেই বুঝা যায় যে ভাবের সহিত নিকট সম্বন্ধ।

কেহ যদি নির্জনে মনে মনে ভগবানের নাম করিতে বসে এবং উহাতে যদি তন্ময়তা আসে তবে আপনা হইতে অনেক সময় উচ্চৈঃস্বরে নামও হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সঞ্চালনও হইয়া থাকে। ইহাকেই কায়মনোবাক্যে নাম করা বলে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকে মনে মনে নাম করিতেছে, আবার সঙ্গে অন্য বিষয়ও চিন্তা করিতেছে অথবা হাত দ্বারা অন্য কাজ করিতেছে। এই-সব স্থলে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিলে ঐ শব্দের প্রতি মন আকৃষ্ট হয় বলিয়া চিত্ত স্থির হয়। আরও একটা কথা — যখন কায়মনোবাক্যে নাম করা হয় তখন তোমাদের মধ্যে আর একটা কায়া সৃষ্টি হইতে থাকে এবং সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ যাহা পরে দেখা যায় তাহা ঐ সময় হইতেই হয়। অনেকে হয়তো দীর্ঘ দিন নিষ্ঠার সহিত জপাদি করিয়া যাইতেছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাহির হইতে তাহাদের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তাহাদের উপর রাগদ্বেষাদির প্রভাব যেন সমভাবেই আছে বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতে তোমরা মনে করিয়ো না যে তাহাদের সাত্ত্বিকভাবে

জীবনযাপনের চেষ্টা বৃথা হইতেছে। বৃথা কিছুই যায় না, যে যে-কর্ম করে তাহার ফল থাকিয়াই যায়।

বিভূতির প্রকাশ

মা: সাধনপথে বিভূতির প্রকাশ হইতেই হইবে।

উহা দ্বৈত পথের সাধন হউক বা অদ্বৈত পথের সাধন হউক। রেলগাড়িতে যাইতে তোমরা কত শহর, কত বাড়ি-ঘর, কত-কিছু দেখিতে পাও; আর ভগবানের দিকে চলিতে কিছুই দেখিতে পাইবে না তাহা কি হয়? তবে জানিয়ো, যতক্ষণ পথে থাকা যায় ততক্ষণই বিভূতির প্রকাশ। বিভূতির প্রকাশ যখন বলা হয় তখন যাহা প্রকাশ হয় এবং যাহার নিকট প্রকাশ হয় এই দুই থাকে। দুই থাকিলে

প্রকৃত জ্ঞান কোথায় ? আবার এই প্রকাশগুলিই বা কি ? এগুলি তো তাঁহারই প্রকাশ, তাঁহারই লীলা।

লীলা কি ? না, — লয়, লীন। লীলা থাকে বলিয়াই তো প্রকাশ।

আবার, যখন বিভূতিস্বরূপ হইয়া যাওয়া যায় তখন প্রকাশ অপ্রকাশের কোন প্রশ্নই নাই। এইজন্য বলা হয় যে,

অদ্বৈত স্থিতিতে বিভূতির প্রকাশ নাই। অদ্বৈত বলিবে, স্থিতি বলিবে, আবার ঐ অবস্থায় বিভূতির প্রকাশ হয় কি না জিজ্ঞাসা করিবে, এরূপ প্রশ্ন অচল। যেমন জ্ঞানস্বরূপ বলিলে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বাহিরের একটা স্থিতি বুঝায় সেইরূপ অদ্বৈত স্থিতি বলিলে বিভূতি ও অবিভূতির বাহিরের একটা স্থিতি বুঝায়।

ব্রহ্ম সর্বভূতে ও সর্বরূপে : ব্রহ্মানুভূতিলাভের পথ

ভক্ত : কেহ বলেন ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই। আবার ভক্ত বলেন ব্রহ্মজ্ঞান তো নীচের কথা, ভগবানের লীলাখেলা হইল ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; এইরূপ কত বাদানুবাদ আছে। কিছুই ধরা যায় না।

মা : যা ধরা যায় তাহাই অন্ত। যেখানে বাদ সেইখানেই বাদ (অর্থাৎ বর্জন)। যতক্ষণ বাদ অথবা কথা থাকিবে জানিয়ো যে, উহা পথ সম্বন্ধেই বলা হইতেছে।

পথেই যত ঝগড়া। তাঁহাকে লাভ করিলে আর কথা থাকে না।

ভক্তি এবং জ্ঞানের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। ধরো, কেহ গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা নিল

এবং গুরু তাহাকে ঠাকুর-সেবা করিতে বলিলেন। শিষ্য ঠাকুরকে একটি ঘরে সিংহাসনে বসাইয়া সেবা করিতে লাগিল। এইভাবে কিছুদিন সেবা করিলে নিজ হইতেই তাহার মধ্যে প্রশ্ন উঠিবে, "আমার ঠাকুর কি এতই ছোট যে, শুধু ঘরের এক কোণে ছোট একটি সিংহাসনে বসিয়া থাকে?" কোন রোগের যেমন ছোঁয়াচ লাগে, এইরূপ এই পথে চলিলে এই জাতীয় বিচার মনে উঠিবেই উঠিবে। কারণ,

> ধর্মপথে চলিলে বিচার উঠা স্বাভাবিক। পরে হয়তো সে দেখিতে পাইবে যে, সে যেখানে রান্না করিতেছে কি বাসন মাজিতেছে, সেখানেও তাহার ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। এমন কি, সে যখন পায়খানায় গিয়াছে সেখানেও তাহার ঠাকুর।

> তখন তাহার মনে হইবে, "তবে কি শুচি-অশুচি বলিয়া কিছু নাই? সকল স্থানেই তো ঠাকুর দেখিতেছি।" বাস্তবিক ভগবানে তো শুচি-অশুচি নাই, সর্বত্রই ভগবান্।

ইহার পর সে হয়তো পশু-পাখীর মধ্যে তাহার ঠাকুরকে দেখিতে পাইবে। গাছে তাকাইয়া দেখিলে সেখানেও দেখিবে যে তাহার ঠাকুর বসিয়া আছেন। তাহার নিজের হৃদয়ের মধ্যেও ঠাকুর। এইভাবে সর্বজীবে সর্বস্থানে সে তাহার ঠাকুরকেই দেখিতে থাকিবে। ইহার পর সে হয়তো দেখিবে যে তাহার ঠাকুরই গাছ, পশুরূপে আছেন। পূর্বে-সে গাছের মধ্যে ঠাকুরকে আলাদাভাবে দেখিতেছিল, এখন গাছকেই ঠাকুররূপে দেখিতেছে। নদী, পশু, পক্ষী যাহা-কিছু দেখিতেছে সমস্তই ঠাকুরের রূপ বলিয়া

মনে হইতেছে, এবং কেবল তাহাই নহে, সে নিজকেও ঠাকুররূপে দেখিতেছে। এক ঠাকুরই যে সর্বব্যাপী একমাত্র সত্তারূপে বিরাজ করিতেছেন এ বোধ তাহার আসিবে। এইভাবে তাহার দ্বৈত-জ্ঞানের লোপ হইবে এবং ব্রহ্ম যে তাহার ঠাকুরেরই অঙ্গকান্তি বা অঙ্গজ্যোতিঃ এইরূপ বোধ হইবে। এখানে কিন্তু তাহার দ্বৈত বা অদ্বৈত জ্ঞানের মধ্যে কোন ভেদ নাই। পূর্বপর হিসাবে এখানে যাহা বলিলাম তাহা কিন্তু সকলের বেলায় সমান হইবে না; কারণ, সকলের অবস্থা তো এক নয়। পূর্ব পূর্ব জন্মে কে কতখানি অগ্রসর হইয়া আছে তাহা তো জানা নাই। তাহা ছাড়া গুরুশক্তিও আছে। গুরু ইচ্ছা করিলে শিষ্যকে যে-কোন অবস্থা দিতে পারেন, আবার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি হওয়াও স্বাভাবিক।

কারণ, তিনি তো অনন্তরূপে অনন্তভাবে আছেন। কাজেই এই পথের অনুভূতিও অনন্ত প্রকার হইতে পারে। যাহা হউক, কিরূপে দ্বৈতভাব হইতে অদ্বৈতভাবে আসা যায় তাহা দেখা গেল।

আবার, জ্ঞানীদের কথাই ধরো। তাহারা বিচার নিয়াই আরম্ভ করে,—'নেতি, নেতি' করিয়া তাহারা নিত্যবস্তু ধরিতে চেষ্টা করে। জগতে সকল জিনিসই পরিবর্তনশীল দেখিয়া তাহারা বলে যে ইহা ব্রহ্ম নয়, কারণ ব্রহ্ম নিত্যবস্তু; তাঁহার কোন পরিবর্তন নাই।

এইভাবে বিচারফলেই হউক বা ধ্যানযোগেই হউক যে যখন নিত্যবস্তু লাভ করিবে বা অনুভব করিবে তখন তাহার বহুত্ব গিয়া একত্বে স্থিতি হইবে। এই অবস্থায় যদি তাহার মাঝে মাঝে জগতের জ্ঞান

আসে তখন বলিতে হইবে, ব্রহ্মে তাহার স্থিতি হয় নাই। অন্তঃস্নান, বহিঃস্নান-এর কথা বলা হইয়াছিল না? অর্থাৎ স্নান করিতে গিয়া শরীরের সামান্য অংশ বা একটি চুলও যদি না ভিজে তবে তাহার স্নান হইল কিরূপে? সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর যদি মাঝে মাঝে জাগতিক জ্ঞানের উদয় হয়, তবে আর প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল কিরূপে? এই যে লাভ বা অনুভূতি বলা হইতেছে ইহাও কিন্তু ঠিক হইতেছে না, কারণ এইসব কথাতেও দ্বৈতভাবে থাকে। কেন-না লাভ বলিতে কেহ কিছু লাভ করিল বুঝা যায়। অনুভূতি বলিলেও তাহাই। এক জন অন্য কিছু অনুভব করে। কাজেই, কথায় কথায় এই ভাব বা অবস্থা বুঝানো যায় না। সেইজন্য বলা হয় যে, যাহা আছে তাহাই আছে—ক্রমে তিনি-ই।

আবার কেহ যদি বিচার করিতে করিতে বা ধ্যানযোগে একত্বের বা এক সত্তার মধ্যে বোধশূন্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও তো একটা জড় ভাব হইল। সেইজন্য দেখা যায় যে, ঐ অদ্বৈত ভাব হইতে আবার দাস, প্রভু ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়। এই-সব ভাব কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় খণ্ড ভাব নয়—ইহাও অখণ্ড ভাব, ইহা অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত ভাব। যেমন, হনুমান রামচন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ বুঝাইতে বলিয়াছিল যে, সে আর রামচন্দ্র এক। আবার অংশাংশি ভাবও আছে, প্রভুদাস ভাবও আছে। এখানে জ্ঞানী দেখিতেছে যে সেই এক সত্তাই অনন্ত আকারে অনন্ত প্রকারে প্রকাশমান আছে।

কাজেই ভক্ত এবং জ্ঞানী এক জায়গায় আসিয়াই

পৌঁছে। ভক্ত তাহার ঠাকুরকে সর্বরূপে দেখিতে দেখিতে বুঝিতে পারে যে এক ঠাকুর ভিন্ন জগতে আর কোন সত্তা নাই। জ্ঞানী আবার বিচারের পথে এক সত্তায় পৌঁছিয়ে সেই সত্তাকেই অনন্তরূপে প্রকাশমান দেখে। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পথের।

ব্রহ্মানুভূতি

মা ঃ বিশুদ্ধভাব জাগিলেই লোকে বুঝিতে পারে ; চেষ্টা বা কর্মের মধ্যে কোন সার নাই। তখন সে ভগবানের হাতের পুতুলের মত হইয়া যায়। তিনি যেভাবে নাচান সেইভাবে সে নাচে। বিশুদ্ধভাবকে

জাগাইতে হইলে একটা পথ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। সে ভাবটা দ্বৈতভাবেরই হউক কি অদ্বৈতভাবেরই হউক তাহাতে কিছু আসিয়া-যায় না।

'আমিই সব', 'আমিই সব' অথবা 'তুমিই সব', 'তুমিই সব' এইরূপ একটি ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। এইভাবে থাকিতে থাকিতে দেখা যায় যে, তখন আর দুইটি নাই। 'আমি' আছে অথবা 'তুমি' আছে। এক অখণ্ড সত্তায় তখন সব লয় পায়। ইহাই ব্রহ্মের অনুভূতি, ইহাই ভগবান্ লাভ করা।

কথাতে ইহা প্রকাশ করা যায় না। উহা বুঝিবার জন্য শুধু লাভালাভ বলা। কথার মধ্যে আসিলেই উহা খণ্ড হইয়া যায়। ভাষা তো ভাসাই।

আনন্দ থাকিলেই উহার পশ্চাতে নিরানন্দ

থাকিবে। ব্রহ্মানুভূতি আনন্দ ও নিরানন্দের বাহিরের এক্ অবস্থা।

যেমন ভিজা কলসী দূর হইতে দেখিলেই তোমরা উহা জলে ভরা মনে করো; কারণ, সাধারণতঃ জলভরা কলসীই ভিজা দেখায়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ লোকের হাবভাবে আনন্দের মতো একটা ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু উহা আনন্দ নহে। সে ভাবটা যে কি তাহা ভাষার অতীত।

ব্রহ্মোপলব্ধি জ্ঞান-অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে

মা ঃ জীবকে ভগবান্ অজ্ঞানের পর্দা দিয়া ঢাকিলেও উহাতে আবার জ্ঞানের দরজা রাখিয়া দিয়াছেন। সে ঐ দরজা দিয়াই মুক্ত হইতে পারে।

তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পরমবস্তু পাইতে হইলে, ভগবান্‌কে পাইতে হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞানের উপরে উঠিতে হইবে। যতক্ষণ জ্ঞান ও অজ্ঞান আছে, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায়, তখন সমস্ত ভেদ জ্ঞান উহাতে লয় হয়।

['জ্ঞান ও অজ্ঞান' দ্রষ্টব্য]

ভগবান্ সর্বভূতে সর্বকারণে

প্রশ্ন ঃ মা, ধন, মান, পদোন্নতি ইত্যাদি কি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যায়? বা এরূপ প্রার্থনা করা কি দোষণীয়?

মা ঃ আমি বলি যদি কিছু চাইতে হয় তবে

ভগবানের কাছেই চাও। তোমার যাহা-কিছু আছে তাহা লইয়াই তাঁহার কাছে উপস্থিত হও। তিনি যে কৃপাময় কল্পতরু। তাঁহার কাছে লোক যাহা চায় তাহাই পায়। ভগবানের কাছে যদি কিছু চাইতে হয় তবে তাঁহাকেই চাহিবে, কারণ তাঁহাকে পাইলে সমস্তই পাওয়া যায়।

মনে করো তুমি পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করো। ঐ আকাঙ্ক্ষা করিয়া যদি তুমি ভগবান্‌কে চাও এবং পাও, তবে দেখিবে যে সকলের পুত্রই তোমার পুত্র। এখানে নিজের পুত্র এবং পরের পুত্র বলিয়া কোন পার্থক্য থাকিবে না। এইরূপে ধন, মান এবং পদোন্নতি; কারণ ঐ সমস্তই ভগবানের মধ্যে আছে। তাই—

ভগবান্‌কে পাইলেই সব পাওয়া যায়। তবে যদি বিষয় চাও তবে বিষয়ই পাইবে। কিন্তু বিষয় তো বিষ, জহর। উহার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণাও আসে।

ইহাও ভগবানের করুণা; কারণ তিনি আঘাত দিয়া লোককে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া নেন। তাহা না হইলে যে লোকে তাঁহার দিকে তাকাইত না। আর দুঃখ অভাবের সঙ্গে যদি ভগবান যুক্ত থাকেন তবে ওগুলি দুঃখের কারণ হয় না। যদি সর্বভাবে ভগবান্‌কে দেখিতে অভ্যস্ত হও, যদি মনে করিতে পারো যে, ভগবান্, যে সুখ পাইতেছি তাহা তোমার দান, যে দুঃখ পাইতেছি তাহাও তোমারই দান, তুমি ভাব ও অভাবরূপে আমার কাছে আসিতেছ, তখন দেখিবে যে জগতে কিছুই তোমাকে অশান্তি

দিতে পারিবে না। তুমি সর্বরূপে ভগবান্‌কে পাইয়া পরম শান্তি, পরম আনন্দ লাভ করিবে।

ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাসলাভের সহজ উপায়

প্রশ্ন ঃ মা ভগবানে সহজে ভক্তিবিশ্বাস কিরূপে হয় ?

মা ঃ ভগবানে ভক্তিবিশ্বাস লাভ করিতে হইলে কর্মদ্বারা একলক্ষ্য হওয়া দরকার। গুরু যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন সেই পথে নির্বিচারে চলিতে হয়। গুরু-নির্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে যে সাহায্য দরকার তাহা আপনা হইতেই আসে।

মন স্থির হইল না বলিয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। মন তাহার আহার না পাইয়াই চঞ্চল। মনকে

আহার দাও, উহাকে পুষ্ট করো ; তাহা হইলে মন আপনা হইতেই শান্ত হইবে। পূর্ণানন্দই মনের আহার। মন ঐ আনন্দই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

জাগতিক নানা বিষয়ের মধ্যে মন আনন্দের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কিছুতেই সে পূর্ণানন্দ পায় না বলিয়া সে চঞ্চল। এই পূর্ণানন্দ আমাদের স্বভাবেই আছে এবং উহার আস্বাদও মনের জানা আছে। সেই-জন্য জাগতিক খণ্ড খণ্ড আনন্দ উহাকে তৃপ্ত করিতে পারে না।

মনকে আমি বাচ্চা বলি। শিশু যেমন মাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, মাকে না পাইয়া শান্ত হয় না ; মনও সেইরূপ মাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পূর্ণানন্দই হইতেছে উহার মা। আবার, মনকে

আমি বড় সাধকও বলি। সাধক যেমন তাহার অভীষ্ট লাভ না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না — অনবরত কেবল অভীষ্ট লাভের চেষ্টা করিতে থাকে, মনও সেইরূপ পূর্ণানন্দ লাভের জন্য উতলা হইয়া আছে।

সদ্‌ভাব দ্বারা উহাকে পুষ্ট করো। অভ্যাসের ফলেই মন শান্ত হইবে। সংসারের যে কাজকর্ম করিতেছ তাহা করিতে থাকো। ওগুলিকেও আমি বৃথা বলি না ; কিন্তু সর্বদা ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। ঐ লক্ষ্য থাকিলেই একদিন পরমার্থ লাভ করিতে পারিবে।

যেমন গাছ ও ছায়ার মধ্যে সম্বন্ধ সেইরূপ 'সোহহং' ও 'অহং'-এর মধ্যে সম্বন্ধ। আমাদের 'অহংটাও সেই 'সোহহং'-এর ছায়া। গাছের ছায়া

ধরিয়া অগ্রসর হইলে যেমন গাছের গোড়ায় পৌঁছানো যায়, সেইরূপ ভগবানের প্রতি লক্ষ্য স্থির থাকিলে জাগতিক বিষয়ের ভিতর দিয়াও ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

ভাগবত সাধনার মূল পথ

মা : যাহারা নামরূপ লইয়া আছে তাহারা বলিবে যে, শুধু নাম হইলেই সব হয়, কারণ নাম আর নামী এক। আবার, যাহারা জ্ঞানের পথ লইয়া আছে, তাহারাও বলিতেছে যে, শুধু মুখে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিলেই চলিবে না ; উহা ভালভাবে ধারণা করা চাই। এগুলি ভগবান্ লাভ করিবার বিভিন্ন পথ। কাজেই এখানে বিরোধ নাই। কেহ হয়তো বলিতেছেন,

একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নাই। আবার, কেহ বলিতেছেন যে সর্বরূপে সর্বভাবে একমাত্র তিনিই আছেন। আমরা দ্বৈতভাবের মধ্যে আছি বলিয়া ভগবানের নাম ভাগ ভাগ করিয়া দেখি। আমরা বলি যে, এই এই নামে ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে, আর এই এই নামে পাওয়া যাইবে না। আবার ইহাও বলা হয় যে,

> লক্ষ্য যদি ভগবান্ হয়, তবে যে-কোন নামে তাঁহাকে ডাকিলেই পাওয়া যাইবে। কারণ সকল নামেই যে তাঁহার নাম।

তিনি নাই কোথায়? সেইজন্য প্রহ্লাদ বলিয়াছিল যে, তাহার কৃষ্ণ স্ফটিকের স্তম্ভের মধ্যে আছেন; এবং দেখা গেল যে, ভগবান্ স্তম্ভের ভিতর হইতেই নিজকে প্রকট করিলেন। জলে স্থলে সর্বত্রই তো তিনি।

সেইজন্য প্রহ্লাদকে জলে ফেলিয়া, পাহাড় হইতে মাটিতে ফেলিয়া মারিতে পারা গেল না; কারণ যেখানেই তাহাকে নিক্ষেপ করা হউক না কেন, সে তো ভগবানের কোলেই পড়িয়াছিল। কাজেই তাহাকে নাশ করিবে কে? সেইজন্য আমরা বলি যে, মাটি কিনা মাটিই, অর্থাৎ ভগবান্ ভিন্ন কেহ নহে। এক-ভাবে বলা হয় যে, স্তম্ভে ভগবান্ আছেন, শিলাতে নারায়ণ আছেন। আবর, অন্যভাব হইতে বলা যায়, স্তম্ভে ভগবান্ কোথায়? স্তম্ভই তো ভগবান্; শিলাতে নারায়ণ কোথায়? শিলা কোথায়? এ তো নারায়ণই। তাই বলা হইয়াছে যে,

> ভগবান্ যদি লক্ষ্য হয়, নাম জপ ক্রিয়া ধ্যান ধারণা যাহাই করা হউক না কেন তাহাতেই ভগবান্ লাভ হয়। এগুলির উদ্দেশ্য হইল

নিজের মধ্যে ভগবান্‌কে ফুটাইয়া তোলা। এই-জন্য বলা হয় 'রামজীর জয়', 'জয় মা'। আরে রামজী বা মার কি পরাজয় আছে যে তাহাদের জয় হোক বলিতে হইবে। তাঁহারা তো নিত্যই জয়যুক্ত। তবে ঐ সব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্ যে নিত্য জয়যুক্ত আছেন তাহা যেন আমি অনুভব করতে পারি। সেইজন্য 'জয় মা' 'জয় হরি', 'জয় শিব' বলা হয়।

মনের একাগ্রতায় অভীষ্টসিদ্ধি

মা : মন জগতের নানা বিষয়ে ছড়াইয়া আছে এবং ঐখান হইতে রসগ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে। যতদিন মন ঐ-সব ছাড়িয়া একাগ্র না হইবে

ততদিন তাহার সূক্ষ্ম গতি আরম্ভ হইবে না। মনের সূক্ষ্ম গতি আরম্ভ হইলেই সেই মহান্ প্রকাশটা সুগম হইয়া আসে।

সেইজন্য তোমাদিগকে সর্বদা সৎসঙ্গ, সদালোচনা এবং ধ্যান-জপাদি লইয়া থাকিতে বলি।

যাহারা সংসারী তাহাদের সংসারের কাজগুলি তাঁহার সেবা মনে করিয়া করিবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় শুধু তাহার ধ্যান বা চিন্তার জন্য রাখিবে।

তখন আর কোন চিন্তা নাই। শুধু তিনি আছেন আর আমি আছি — এই ভাব; এইভাবে বিছুক্ষণ নির্জনে ধ্যান করিলে কি হইবে? না, সংসারের অন্যান্য কাজ যে তাঁতার সেবা হিসাবে করিতেছে ঐ ভাবটা আরও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। এইভাবে

এককে লইয়া চলিতে চলিতে মন একদিন একাগ্র হইয়া যাইবে এবং একাগ্র হইলেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া যাইবে।

মনের স্থিরতা আসে নামের অভ্যাসে

প্রশ্ন ঃ মা, নাম করার সময় মন তো এক মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকে না। অস্থির মন লইয়া নাম করিলে কি কোন ফল হয়?

মা ঃ ফল নিশ্চয়ই হয়। নাম করিতে করিতে মন স্থির হইয়া যায়।

মন্ত্রচৈতন্য

প্রশ্ন ঃ মা, মন্ত্রচৈতন্য কাহাকে বলে?

মা ঃ মন্ত্রচৈতন্য কেমন? ধরো, যেন আমি তোমাকে 'বাবা বলিয়া ডাকিলাম, তুমি অমনি উত্তর দিলে। নাম নামী অভেদ কি-না। তাই নাম ধরিয়া ডাক দিলে নামী সাড়া দেয়।

মন্ত্র উচ্চারণমাত্রই যদি মন্ত্রদেবতা বা ইষ্টের সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তবে সেই মন্ত্রকে চেতনমন্ত্র বলা যায়। ইহাই মন্ত্রচৈতন্য।

প্রশ্ন ঃ এই যে মন্ত্রদেবতা বা ইষ্ট সাক্ষাৎকারের কথা বলিলে ইহাই বা কেমন? সাধক কি নিজকে ইষ্ট হইতে আলাদা দেখেন, না, নিজকে ইষ্টের মধ্যে দেখেন?

মা ঃ প্রথম প্রথম সাধক নিজকে ইষ্ট হইতে

আলাদা দেখিলেও মন্ত্রদেবতা বা ইষ্টের যখন তত্ত্ব প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তখন সেই তত্ত্বের মধ্যে সাধক নিজকেও দেখে। সেইজন্য বলা হয় না যে, দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিতে হয়? ইষ্ট-পূজা করিতে গিয়া সাধক তখন নিজকেই পূজা করে। অর্থাৎ, ইষ্ট আর সাধক তখন এক হইয়া যায়।

মন্ত্র জপের ফল

প্রশ্ন ঃ মন্ত্র জপ করলে কি সূক্ষ্ম শরীরে পরিবর্তন হয়?

মা ঃ রূপ থাকলেই পরিবর্তন হবে। ভগবানের রূপ অপরিবর্তনশীল।

প্রশ্ন ঃ মন্ত্র জপ করলে কি একতা প্রকাশ পায়?

মা ঃ 'একতা প্রকাশের কথা এখন রাখো। আগে ভগবানের দিব্যমূর্তির প্রকাশ হোক, তার পর একব্রহ্মের প্রকাশ হবে। যে-ই নাম ধরে ডাকবে সে-ই রূপ প্রকাশ হবে।

প্রশ্ন ঃ মন্ত্র জপ করলে কি অন্য কোন লোকের বা ধামের আবির্ভাব হয়?

মা ঃ নিশ্চয় হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য হওয়া উচিত লোকাতীত লোকের স্বয়ংপ্রকাশ ভাব জানা।

প্রশ্ন ঃ মন্ত্র জপ করলে কি ব্রহ্ম পর্যন্ত প্রাপ্তি হতে পারে?

মা ঃ কেন হবে না?

প্রশ্ন ঃ শব্দব্রহ্মেরও কি সাক্ষাৎকার হয়?

মা ঃ হওয়াই তো চাই। মন মানে দুই মেনে চলা। তাই সুখ-দুঃখের অনুভব হয়। বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়ে দেয়। জীব সেই যে বদ্ধ হয়ে আছে এই সংসারে। জল যেমন বদ্ধ জায়গায় থাকলে গন্ধ হয়, আবার filter করে নিলে পরিষ্কার হয়, কীটাণু তাতে নাশ হয়, সেইরকম মুক্ত জীব আর বদ্ধ জীব। শুদ্ধ জল হলেন পরমাত্মা, আর জীব বদ্ধ জলের মতন। কিন্তু জলত্ব যেমন দুটোতেই আছে, আত্মাও সেই রকম। যত্র জীব তত্র শিব। জীবের শিবত্ব বা আত্মত্ব শাশ্বত।

মা অন্তর্যামিনী

প্রশ্ন ঃ আমরা তোমার বিষয় চিন্তা করিলে তুমি আমাদিগকে দেখিতে পাও ?

মা ঃ হাঁ, টর্চের আলো ফেলিলে জিনিসগুলি যেভাবে ফুটিয়া উঠে, তোমরা যখন আমার কথা চিন্তা করো, তখন তোমাদের মূর্তিও আমার মধ্যে সেইভাবে ফুটিয়া উঠে।

মা ভোগ করেন সন্তানের ব্যথা-বেদনা

মা ঃ এমনও হয় যে, লোকে যেভাবে ব্যথা-বেদনা ভোগ করে, এ দেহও হুবহু সেইভাবেই উহা ভোগ করে। এই দুইয়ের মধ্যে কোন ইতরবিশেষ নাই। কারণ, অন্য লোকের সঙ্গে এ দেহের তো কোন ভেদ জ্ঞান নাই।

মুখে বলিবে যে 'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি', আর ব্যবহারে দেখা যাইবে যে আলাদা আলাদা ভাব

আছে, তাহা তো হইতে পারে না। বাস্তবিক এমন একটা অবস্থা আছে যেখানে ভেদজ্ঞান মোটেই থাকে না।

মায়ের আসন

মা ঃ এ-দেহের আসন আপনা হইতেই হইত। বাজিতপুর তো ততটা নিরিবিলি ছিল না: বিদ্যা-কুটে যখন ছিলাম তখন সন্ধ্যা হইলেই ভগবানের নাম করিতে বসিতাম। ঘরখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতাম, কারণ উহা মন্দির কিনা। ঐখানে বসিয়া ভগবানের নাম করা হয়। সন্ধ্যাবেলা নাম করিতে বসিয়া নিজেকে একেবারে ভগবানের হাতে ঢালিয়া দিতাম। ভগবানের হাতে সম্পূর্ণরূপে

ঢালিয়া না দিলে তো ভগবান্ গড়িয়া নিতে পারেন না। যদি পেছন হইতে কোন টান বা আকর্ষণ থাকে, তবে নাম করিতে গিয়া ভগবানের পরশ পাওয়া যায় না। কিন্তু যখনই সমস্ত আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ভগবানের নাম লইতে আরম্ভ করা যায় তখনই দেখা যায় যে ভগবান্ কিভাবে আসিয়া সাধককে গড়িয়া তোলেন। সন্ধ্যাবেলা সমস্ত শরীর ছাড়িয়া যখন ভগবানের নাম করিতে আরম্ভ করিতাম তখন দেখিতাম যে আসন আপনা-আপনি হইয়া যাইত। ধীরে ধীরে শরীরটা সোজা হইয়া উঠিত এবং উহা এমনভাবে সটান হইত যে ইচ্ছা করিয়া উহা ঘুরানো-ফিরানো যাইত না। আবার, যখন ঐ ভাবটা চলিয়া যাইত তখন শরীর আপনা-আপনি নুয়ে পড়িত।

প্রশ্ন ঃ নামের গুণে এইসব হয়, না নিজেকে ভগবানের হাতে ঢালিয়া দেওয়ার ফলে এইরূপ হয় ?

মা ঃ দুই কারণেই হইতে পারে। নামের শক্তি তো আছেই। তাহা ছাড়া বেপরোয়াভাবে নিজেকে ভগবানের কাছে ঢালিয়া দিলেও নামের শক্তি যখন প্রকাশ হয় তখন শরীরের বা মনের উপর কাহারও হাত থাকে না। আবার, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিয়া নাম করিতে পারিলেও নামের শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

['মায়ের নাম করিবার খেয়াল' দ্রষ্টব্য]

মায়ের কোল

জনৈক মহাত্মা (কাশীর শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমে) ঃ মা, দিন দিন যেরূপ নূতন নূতন লোক

আসিয়া তোমার কোল অধিকার করিয়া বসিতেছে তাহাতে মনে হয় যে ঐ কোলে আমাদের আর জায়গা হইবে না।

মা ঃ বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণার কোল তো আর ছোট নয়। এ-জাতীয় ভয়ের কারণ নাই।

মহাত্মাজী ঃ আমরা বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণার কোল তো চাহি না, আমরা তোমার কোল চাই।

মা ঃ এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ? যদি বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণার এত বড় কোলেও কাহারও জায়গা না হয়, তবে তাহার কোলের আশা ত্যাগ করা ভাল।

মা : আমি তো সর্বদাই বলি যে ছোটবেলায় এ-দেহের গুরু ছিলেন বাপ-মা। পরে যখন বিবাহ হইল তখন বাপ-মাই বলিয়া দিলেন যে, স্বামী গুরু। তারপর জগতে যাহা কিছু আছে সকলেই এ-দেহের গুরু। সেই অর্থে বলিতে পারি যে, আত্মাই গুরু, অথবা এ দেহই এ দেহের গুরু। তাহা ছাড়া পূজার কথায় তো আমি বলিয়া থাকি যে, যখন কোন দেবতার পূজা করা হয় তখন এ দেহ হইতেই দেবতাকে বাহির করিয়া পূজা করা হয় এবং পরে এ দেহের সঙ্গেই মিশাইয়া দেওয়া হয়। সেইভাবে গুরু সম্বন্ধেও তোমরা অনুমান করিয়া লইতে পারো। এইমাত্র বলিলাম যে, দীক্ষার সময় পূজা, যজ্ঞ করিতে ফুল ফল ইত্যাদি যাহা-কিছু

প্রয়োজন হইয়াছিল সমস্তই এ দেহ হইতে প্রত্যক্ষ-ভাবে বাহির হইয়াছিল আর গুরু কি এ দেহ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না।

মায়ের দীক্ষা

মা : এ দেহের দীক্ষা হয় ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রিতে। ঝুলন-যাত্রা দেখিতে ঐ দিন অনেকেই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভোলানাথেরও খাওয়া-দাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহাকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে শুইয়া শুইয়া উহা টানিতেছে এবং আমি কি করিতেছি তাহা দেখিতেছে। আজ যেভাবে আমি ঘরের মেঝে

লেপিয়া আসন করিয়া বসিয়াছি ইহা তাহার কাছে একটু নূতন বলিয়াই বোধ হইতেছিল। কিন্তু ইহা দেখিতে দেখিতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। এদিকে মজাও এমন, দীক্ষা লইতে যেরূপ যজ্ঞ এবং পূজা করিতে হয় তাহা আপনা-আপনিই এ দেহ হইতে লইয়া গেল। যজ্ঞস্থালী সম্মুখে স্থাপন করা হইল। পূজারও সমস্ত আয়োজন পুরাপুরি তৈয়ার। ফুল, ফল, জল ইত্যাদি সবই প্রত্যক্ষরূপে বর্তমান। যদিও সকলে ইহা দেখিতে পাইবে না, উহা যে সবই সত্য সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নাভি হইতে দিক্ষা-মন্ত্র স্ফুরিত হইয়া জিহ্বা দিয়া উহা বাহির হইল। পরে হাত দিয়া ঐ মন্ত্র যজ্ঞস্থালীর উপর লেখা হইয়া গেল এবং ঐ দীক্ষামন্ত্রের উপর পূজা এবং আহুতি ইত্যাদি হইল, অর্থাৎ বিধিপূর্বক দীক্ষাগ্রহণ করিতে

যাহা করিতে হয় সবই হইয়া গেল। তাহার পর যখন কর ঘুরাইয়া দীক্ষামন্ত্র জপ আরম্ভ হইল তখন ভোলানাথ জাগিয়া দেখে যে, আমি জপ করিতেছি। এ দেহ তো কখনও কর ঘুরাইয়া জপ করে নাই এবং কেহ ইহাকে উহা দেখাইয়াও দেয় নাই। কিন্তু আপনা-আপনি কর ঘুরাইয়া জপ চলিতে লাগিল। ভোলানাথ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু পরদিন যখন নিজে নিজে জপ করিতে গেলাম তখন দেখি যে সবই উলট-পালট হইয়া যাইতেছে। পরে দেহে আবার ঐ অবস্থা আসিলে আপনা-আপনি জপ হইয়া যাইত। এইভাবে এ দেহের দীক্ষা হইয়া গেল।

ম. : পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাজিতপুর আসার পর হইতেই নিত্য নাম করিবার একটি খেয়াল হইয়াছিল। যে ঘরখানায় থাকা হইত তাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইত। বাহিরের সঙ্গে তাহার একটা কুটারও যেন যোগ না থাকে তাহা দেখা হইত। সন্ধ্যাবেলা বাহির হইতে ঘরের চারিদিকে ধূপ ঘুরাইয়া লইয়া আসা হইত। কারণ, ইহা যে মন্দির এখানে বসিয়া নাম করা হয়। তখন পর্যন্ত কিন্তু দীক্ষা হয় নাই! যদিও প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা জপ করিতে বসা হইত, উহা আর কিছুই নয়, শুধু 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলা মাত্র। এই সময় শরীরের যে যে অবস্থা হইত তাহা কিন্তু নামের গুণেই প্রকাশ হইত। এই সময় একদিন ভোলানাথ

আমাকে বলিল, "আমরা শাক্ত, তুমি সর্বদা 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলো কেন? ইহা তো ভাল নয়।" ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তবে কি বলিতে হইবে? 'জয় শিব-শঙ্কর', 'বম্ বম্ হর হর বলিব? এই দেহ তো মন্ত্র ইত্যাদি কিছুই জানে না, কাজেই যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিলাম।" ইহা শুনিয়া ভোলানাথ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ উহাই বলিয়ো।" ইহার পর হইতেই 'জয় শিব-শঙ্কর' নাম চলিতে লাগিল।

কিন্তু যখন 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতাম তখন হইতেই এ-দেহের আসন ইত্যাদি হইতে থাকিত এবং উহা ক্রমেই প্রবল হইতেছিল। 'জয় শিব-শঙ্কর' নাম করার সময় উহা আরও প্রবল হইল। কত রকম যে আসন হইত—সিদ্ধাসন, পদ্মাসন,

গোমুখী আসন একের পর এক হইয়া যাইত। মজাও এমন যে, নাম করিতেছি এমন সময় হঠাৎ শরীরের পরিবর্তন হইয়া আসন হইয়া গেল এবং মেরুদণ্ডের দিকে হট্ হট্ শব্দ হইয়া একেবারে সোজা হইয়া বসিলাম। এ বসার মধ্যে কোন জোর-জবরদস্তি নাই, কোন অস্বস্তিভাব নাই। এই অবস্থায় আর শরীরকে এদিক সেদিক করা যাইত না বা নোয়ানো যাইত না। মনে হইত সব যেন স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর নাম আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত এবং একটা তন্ময় ভাব আসিয়া পড়িত। এই ভাব কিছুদিন চলিল।

মায়ের প্রণব উচ্চারণ

প্রশ্ন ঃ মা, তোমার কিভাবে প্রণব উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা শুনিতে চাই।

মা ঃ এ-দেহ যখন ছোট ছিল, তখন এ-দেহের বাপ-মা, ইহাকে লইয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নানে গিয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া তাহারা গুরুবাড়ী দীক্ষা লইতে গেল। দীক্ষার পর তাহারা নদীর ধারে আসিয়া দীক্ষামন্ত্র জপ করিতে বসিয়া গেল। নতুন দীক্ষা কিনা। পাছে আমি দীক্ষামন্ত্র শুনিয়া ফেলি এইজন্য আমাকে নৌকার উপর চিড়া-বাতাসা দিয়া বসাইয়া দিল। তখনকার দিনে বাতাসাগুলিও বেশ ছিল বড় বড়, লাল লাল। আমি চিড়া-বাতাসা খাইতে লাগিলাম, আর আপন মনে গড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি শুইয়াই শুনিতে পাইলাম যে, একজন

আর একজনকে বলিতেছে 'ওঁ' শব্দ স্ত্রীলোক কখনও উচ্চারণ করিবে না এবং যেখানে 'স্বাহা' বলিতে হইবে সেখানে 'নমঃ' বলিবে।" তাহা ছাড়া, স্ত্রীলোক যে প্রণব উচ্চারণ করিতে পারে না তাহা ছোটবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। পরে এ দেহের উপর যখন সাধনের খেলা আরম্ভ হইল এবং যখন মুক্তভাবে ভিতর হইতে প্রণব উচ্চারণ হইতে লাগিল তখন উহা 'বাহির হইয়া গেল, বাহির হইয়া গেল' বলিয়া উহা চাপিবার কত চেষ্টা! কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? জলের কল খোলা থাকিলে যেরূপ গব্ গব্ করিয়া জল পড়িতেই থাকে, উহা আর থামানো যায় না। সেইরূপ এ-দেহের মুখ হইতে আপনা-আপনি প্রণব উচ্চারিত হইয়া যাইতে লাগিল। এ-দেহের তো কিছুই ইচ্ছা বা চেষ্টাসাপেক্ষ নয়— সবই আপনা-

আপনি হইয়া যাইতেছে। এখনও যে মন্ত্রাদি বাহির হয়, বা কাহাকেও কিছু দেই তাহা ঐরূপ। উহা পাইয়া কেহ কেহ মনে করে যে তাহারা এ-দেহ হইতে দীক্ষা পাইল। কিন্তু কিছু দেওয়া-টেওয়া এ-দেহের ভাব নয়। জগৎগুরু দীক্ষা দেন বলিয়া বলা হয়; কিন্তু এ-দেহ দিবে কাহাকে? অপর কিছু থাকিলে তো দিবে? এ-দেহের নিকট সবই যে অ—পর!

মায়ের বাণীর বৈশিষ্ট্য

মা ঃ তোমরা যে প্রশ্ন করো তাহার উত্তর আমি দেই না।

প্রশ্নও তোমাদের, উত্তরও তোমাদের, কেবল আমার মুখ হইতে বাহির হয় মাত্র।

আমি যাহা বলি তাহা মিথ্যা নয়, কারণ আমি তো কিছু বলি না। তিনি যে সব বলান।

মায়ের ভাব ও ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ও শাস্ত্রসম্মত

মা : টাইম-মতো পাঠে বসা হইতেছে, কি যে শোনা হইতেছে তাহা মা গঙ্গাই জানেন। কিন্তু ইহা দেখিয়া লোকে এমন মনে করিতে পারে যে, আমি যাহা বলি তাহা ঐভাবে পাঠ শুনিয়া শুনিয়াই শিখিয়াছি। পূর্বে এরূপ পাঠ কিছুই ছিল না। তখন এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে উঠিত না। আবার কখনও কখনও কথা বলিতে আমি যাহা বলি তাহা অনেক সময় যাহা পাঠ করা হয় তাহার সঙ্গে মিলিয়া

যায়। ইহার অর্থ এই নয় যে, আমি যাহা শুনি তাহা মনে রাখি এবং উহাই আবার কথার পৃষ্ঠে বলিয়া ফেলি। ব্যাপার কি জানো?

কথা যাহা বলা হয় তাহা এখান হইতেই প্রথম তৈয়ার হইয়া বলা হয় এবং উহা শাস্ত্রের কথার সঙ্গে মিলিয়া যায়। শাস্ত্রের কথা মনে রাখিয়া উহাকে আবৃত্তি করা হয় না।

হাঁ, তবে কখনও কখনও এমনও হয় যে, আমি বলি যে অমুকের কাছে ইহা আমি শুনিয়াছি, এগুলি অবশ্য আলাদা।

জনৈক ভক্ত : আচ্ছা মা, তুমি তোমার উপদেশ-সম্বন্ধে যাহা বলিলে তাহা যেন একরকম বুঝিলাম, অর্থাৎ শাস্ত্র শুনিয়া এবং তাহা মনে রাখিয়া তুমি উপদেশ দেও না। যখন যাহা বলো উহা তখন

তখনই তোমার মধ্যে সৃষ্ট হইয়া বাহির হয়। কিন্তু ভাষা-সম্বন্ধে কি হয়? ভাষাও কি তুমি লোকের কাছে শুনিয়া কিছু শিখ নাই?

মা ঃ না, আমি হিন্দী বলি, মাঝে মাঝে দুই-একটি ইংরেজী শব্দও বলি। এগুলি কিন্তু যাহা খেয়ালে আসিতেছে তাহাই বলিয়া যাইতেছি; ইহা যে পূর্বে শুনিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছি এবং পরে উহাই বলিতেছি এরূপ নয়। তবে বলিতে পারো যে, আমি যে হিন্দী বলি তাহা দোষত্রুটিযুক্ত হয় কেন? সবই তো বিশুদ্ধভাবে বাহির হইতে পারে? এখানে কথা ঐ যে ঘা হয়ে যায়। যখন যেখানে থাকা যায় সেইখানকার ঢং অনুযায়ী আমার কথা বাহির হয়। কথা বলিতে এখন আমি কলিকাতার কথাই বেশী বলি, অথচ কলিকাতার কথা আমার জানা নাই।

ইহার কারণ যাহাদের সঙ্গে কথা বলা হয় তাহাদের ঢং অনুযায়ী কথা বাহির হয়।

ভক্ত ঃ তোমার কথা হইতে ইহাই বুঝিলাম যে, ভাব-সম্বন্ধে তুমি যেমন অপরের নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করো নাই, ভাষা-সম্বন্ধেও ঐ কথা। তোমার ভিতর হইতে যাহা কিছু বাহির হইয়াছে এবং যে ঢং-এ বাহির হইয়াছে, উহা সমস্তই তোমার ভিতর নূতন সৃষ্ট হইয়া বাহির হইয়াছে।

মা ঃ হাঁ, মনে রাখিয়া কিছু বলা এ-দেহের সম্বন্ধে খাটে না। আমিও অনেক সময় তোমাদিগকে বলি যে স্মৃতিটি এখানে নির্মূল।

ভক্ত ঃ মা, অনেকের কিন্তু ধারণা এই যে তোমার অসাধারণ মেধা বলিয়া তুমি একবার মাত্র শুনিয়াই

সব মনে রাখিতে পারো, এবং ভাষার উন্নতি ও নূতন ভাষায় কথা বলার কারণ ইহাই।

মা ঃ (হাসিয়া) হাঁ, আমি তাহা শুনিয়াছি। লোকে এ অবস্থাটা ধারণা করিতে পারে না। পূর্ব-জন্মের সংস্কার অনুসারে এরূপ কথা বলা হইতে পারে, এতদূর পর্যন্ত কেহ কেহ যাইতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু কিছুই বাহির হইতে শিক্ষা করিয়া বলা হয় না — ইহা ধারণা করা খুবই শক্ত।

মায়ের ভালবাসা

মা ঃ এ-কথা সত্য যে, আমি ভাল বা মন্দ বাসিতে পারি না। তবে ইহাও সত্য যে, আমি যেরূপ ভালবাসিতে পারি, জগতে এমন আর কেহ পারে না।

মায়ের মধ্যে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ

প্রশ্ন ঃ মা, আপনার মধ্যে যেভাবে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ হয় সেই কথা শুনিতে ইচ্ছা করে।

মা ঃ একটা কথা তোমাদিগকে বলিতেছি —

> এ-দেহ এখনও যাহা, ছোটবেলায়ও ঠিক তাহাই ছিল। এ-দেহের প্রথম এবং দ্বিতীয় কোন অবস্থা নাই।

এ-কথা আমি গঙ্গার উপরে বসিয়া বলিতেছি। তবে,

> এ-দেহের উপর একটা সাধনার খেলা হইয়াছে। কিছুটা সময় এ-দেহ সাধক সাজিয়াছিল এবং সাধকের যে-সব ভাব হয় তাহাও পূর্ণভাবে এ-দেহে প্রকাশ পাইয়াছিল।

আমি অনেক সময় বলি না যে, দেখিয়া আসি ননী

(জনৈক অসুস্থা) কেমন আছে। তাহা কি আমি এখানে বসিয়া জানি না যে, উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে? কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও যেমন উপরে গিয়া বার বার ননীকে দেখিয়া আসি, আমার সাধনাটাও সেইরূপ হইয়া গিয়াছে।

মায়ের সাধনা

মা : সাধনার কথা যে বলা হয়—আমি কাহার নিকট হইতে সাধনা পাইলাম? কে আমাকে পথ বলিয়া দিল?

দীক্ষাও আমি নিজেই নিজেকে দিলাম। পূজা, মন্ত্র-জপ—যাহা-কিছু হইল, সবই তো আমার নিজের ভিতর হইতে আসিল। আগন্তুক কেহ আসিয়া আমাকে তো কিছু বলিয়া গেলো না।

আমার সাধন-সম্বন্ধে আমি তো অনেকবার বলিয়াছি যে, ইহা খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়। আমি তো সবই জানি। তবুও যে তোমাদিগকে বলি না যে, চলো অমুক জায়গায় একটু বেড়াইয়া আসি। ইহার অর্থ তো এ নয় যে ঐ স্থানে আমি কখনও যাই নাই। জানা-শুনা স্থানে যেমন বেড়াইতে যাওয়া হয়, আমার সাধনাটাও সেইরূপ।

শাস্ত্র যেন টাইম্-টেবিল

প্রশ্ন : শাস্ত্রে বিভিন্ন উক্তি আছে। অনেক সময় উহা পরস্পরবিরুদ্ধ। উহার কোন্‌টি অনুসরণ করিতে হইবে?

মাঃ শাস্ত্রের সকল উক্তিই ঠিক। সাধক সাধনা করিয়া যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই শাস্ত্রে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু ব্যক্ত হইয়াছে কতটুকু? শাস্ত্রকে আমি 'টাইম্-টেবিল' (time table) বলি। দেখো না, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে পথে কোন্ কোন্ স্টেশন পড়িবে তাহা টাইম্-টেবিলে লেখা থাকে। কিন্তু ঐগুলি কেবল স্থানের নাম মাত্র। শুধু নাম পড়িয়া ঐ সকল স্থানের কোন ধারণা করা যায় না। তা' ছাড়া, এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে হইলে যে সকল স্থান পড়ে, উহার সমস্তগুলির নামও টাইম্-টেবিলে থাকে না। মাত্র প্রধান প্রধান কতগুলি স্থানের নাম থাকে।

শাস্ত্রেও সেইরূপ সাধনরাজ্যের সমস্ত কথা নাই, মাত্র কয়েকটি অবস্থার কথা আছে।

কিন্তু উহার কোনও একটি অবস্থা লাভ হইলে ভিতরে যে যে অনুভূতি আসে, এবং এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাইতে ছোট-বড় যে অসংখ্য প্রকার অনুভব হয়, উহার বর্ণনা শাস্ত্রে নাই। এইজন্য

শাস্ত্রের কথাগুলি যে সাধনরাজ্যের শেষ কথা এরূপ অনুমান করা ভুল।

সংসার ও আনন্দ

মা: সৃষ্টি কি? একের বহু হওয়াই সৃষ্টি। যেমন, তোমরা পূর্বে একা ছিলে, পরে বিবাহ করিয়া দুইজন হইলে। পরে ছেলেপিলে লইয়া বহু হইয়াছ।

সেইরূপ ভগবান্‌ও এক হইতে বহু হইয়াছেন। এই যে জগতে যাহা-কিছু দেখিতেছ ইহা তাঁহারই সন্তান, তাঁহারই পরিবারভুক্ত। জীবের বেলায়ও যেমন, ভগবানের বেলায়ও তেমন।

যে গতিতে তুমি এক হইতে বহু হইয়া মায়া-মমতায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছ, ঐ গতি রোধ করিয়া যদি বিপরীত গতিতে চলো, তবেই মুক্তি।

'আমার ছেলে', আমার মেয়ে', 'আমার ধনদৌলত' ইত্যাদি যাহা বলো, ইহাতেই দেখা যায় যে, তুমি এক হইয়াও বহু হইয়া আছো।

এই বহু হইতে একে ফিরিয়া যাওয়াই মুক্তি। সৃষ্টিকর্তার সহিত এক হয়ওাই মুক্তি। যেভাবটা অধোগতিতে বন্ধন সৃষ্টি করে, উহার অধোগকি রোধ করিয়া ঊর্ধ্বগতি করিয়া দিতে হয়। যে

ভাবটা অধোগতিতে কাম, ঊর্ধ্বগতিতে উহাই প্রেম হয়। সেইজন্য ঊর্ধ্বরেতা হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়।

যে জিনিস জগতে তোমাকে আবদ্ধ করিল, সেই জিনিসই ভিন্ন গতিতে তুমি যা ছিলে তাই করিয়া দিবে। এই যে ভিন্নগতি, ঊর্ধ্বগতি, ইহা গুরু শিষ্যকে দেন। স্বভাবের গতি গুরু হইতেই আসে। এইজন্য গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হয়। অবশ্য,

জাগতিক স্নেহ ইত্যাদি, যাহাকে আমরা বন্ধন বলি, ইহা তাঁহারই ক্ষুদ্র প্রকাশ। ইহার মধ্যেও আনন্দ আছে। এই আনন্দ না থাকিলে তো সংসারই চলিত না।

কিন্তু তাঁহাকে না পেলে মহান্ আনন্দ পাওয়া যায় না।

সংসারটা তাঁহারই প্রকাশ — তাঁহারই ছায়া। কিন্তু পূর্ণ আনন্দ, নিত্য আনন্দ পেতে হলে ছায়া ছেড়ে কায়া ধরতে হবে।

সংসার কি বন্ধন ?

প্রশ্ন : আমরা যে ভোগ লইয়া আছি ইহা হইতে ত্যাগের পথে যাইবার উপায় কি ? সংসারটাকে আমরা আপন করিয়া লইয়াছি। ইহা ছাড়িতে ভয় হয়। এই অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায় কি ?

মা : উপায় একমাত্র গুরুকৃপা।

সংসার যদি সেবার ভাবে করা যায়, তাহাতে কখনও বন্ধনের সৃষ্টি হয় না। সংসারমাত্রই বন্ধন নয়। ইহাকে ভোগ করিতে গিয়া আমরা বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছি। ['সংসার ও আনন্দ' দ্রষ্টব্য]

সচ্চিদানন্দ

প্রশ্ন : মা, ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? এবং তাঁহার গুণই বা কি ?

মা : তাঁহার স্বরূপ বা স্বভাব প্রকাশ করা যায় না, কারণ স্বভাব বলিতে গেলেই অভাব আসিয়া পড়ে। ভাষার মধ্যে তাঁহাকে আনিতে গেলেই তিনি খণ্ড হইয়া পড়েন। তবে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে সৎ চিৎ আনন্দ বলা হয়। তিনি আছেন তাই সৎ, তিনি জ্ঞানস্বরূপ তাই চিৎ। এই সৎ-এর জ্ঞান হইলেই আনন্দ। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি আনন্দ ও নিরানন্দের ঊর্ধ্বে।

প্রশ্ন : বেদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলে। তুমি

ব্রহ্মকে ইহার উর্ধ্বে বসাইয়া নূতন কোন জ্ঞান প্রচার করিতেছ নাকি ? এই কি তোমার বাণী ?

মা ঃ নূতন কিছুই বলিতেছি না। শাস্ত্র যাহা বলিয়াছে ঠিকই বলিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছে কতটুকু ?

শাস্ত্র কিরূপ ? না, ছাদে উঠিবার সিঁড়ির মত। শাস্ত্র কেবল এই সিঁড়ির ধাপের বর্ণনা দেয় মাত্র। ছাদে উঠিলে যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার বর্ণনা শাস্ত্রে নাই।

কারণ, যে একবার ছাদে উঠিয়াছে, সে তো নিজেই সমস্ত দেখিতেছে। যাহা দেখিতেছে তাহার বর্ণনার দরকার নাই। পথের বর্ণনারই দরকার। শাস্ত্রেও তাহাই আছে। তাই শাস্ত্র তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলে। প্রকৃতপক্ষে তিনি উহা বটেন, আবার তিনি উহারও উর্ধ্বে।

সৎ চিৎ আনন্দ

প্রশ্ন ঃ 'সৎ' বলিতে যাহা বুঝায়, 'চিৎ' বলিতে তাহা বুঝায় না ; আবার 'আনন্দ' বলিতে অন্য কিছু বুঝায়। একই বস্তুর তিন নাম এক সময় হইতে পারে না। 'সৎ' 'চিৎ' — এগুলিতে গুণ বলা যায় না ; কারণ ব্রহ্মে গুণ নাই। তাহা হইলে একই জিনিসের তিনটি বিভিন্ন নাম হয় কেমন করিয়া ?

মা ঃ চিৎ অর্থে চেতন, জ্ঞান। চিৎ হইতে চিত্ত কিন্তু আলাদা। চিত্ত হইল ঘষা-মাজার জিনিস ; যেমন, চিত্তশুদ্ধি করা বলা যায়। চিত্ত-শুদ্ধি হইলেই চিৎ প্রকাশ হয়।

আর তুমি যে বলিলে, এক জিনিসের তিনটি নাম হয় কি করিয়া। তাহাতে বলা যায় যে, সৎ চিৎ আনন্দ আলাদা আলাদা নয়।

সং অর্থাৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহাতে চিৎ ফুটিয়া উঠে, এবং চিৎ বা জ্ঞানের প্রকাশ হইলেই আনন্দের প্রকাশ হয়।

সৎ-এর প্রকাশ পূর্ণভাবে না হইলে চিৎ-এর প্রকাশ হয় না, উহার আভাসমাত্র আসিতে পারে। যখন সত্যের পূর্ণ প্রকাশ হইল তখনই চিৎ-এর প্রকাশ আরম্ভ হইল। চেতন যতই পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে, আনন্দ ততই পূর্ণভাবে খুলিতে থাকিবে। কাজেই, সৎ চিৎ আনন্দ একই বস্তু — ইহাকে তোমরা ব্রহ্ম বলো। আবার, সৎ এক হইয়াও অনন্ত হইতে পারে। সৎ-কে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিলেই উহা অনন্ত। সেইরূপ চিৎ-ও আনন্দ। সাধন করিতে করিতে সত্যকে খণ্ডভাবে লাভ করা যাইতে পারে। আবার, ভগবানের কৃপায় পূর্ণ সত্যকে একবারেও লাভ করা যাইতে পারে। কত রকমই তো হয়।

সমাধি

প্রশ্ন : সমাধি কি? কি করিলে সমাধি হয়? সমাধি হইলে কি হয়?

মা : সমাধি কিছু নয়। কিছু করিলে সমাধি হয় না।

আমার কথা বুঝি বুঝিতে পারিলে না? সমাধি কিছু নয় যে বলিলাম, তাহার অর্থ এই যে,

কিছু বলিলে একটা অবস্থা বুঝায় যাহা নিত্য নয়। সমাধি হইল তাই, যাহা নিত্য।

উহাকে ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

অবশ্য সমাধি বলিতে অবস্থাও বুঝায়; যেমন জড়-সমাধি, ভাব-সমাধি, সবিকল্প সমাধি ইত্যাদি। এগুলি অবস্থা মাত্র এবং এগুলি বদলাইয়া যায় বলিয়া নিত্য নয়।

প্রশ্ন : চৈতন্য-সমাধিও কি একটি অবস্থা ?

মা : ভাষায় চৈতন্যসমাধি বলা হয় সত্য, কিন্তু উহার অর্থ হইল চৈতন্য-স্থিতি লাভ। এক চৈতন্যময় সত্তাই তো আছেন। তাঁহাকে বুঝাইতেই তো যা' তা' বলা হয়। কিছু করিলে সমাধি হয় না। কারণ, যাহা হয় তাহা থাকে না। যেমন, জন্ম হইলে মৃত্যু হয়। সমাধি তো নিত্যই আছে। ইহা আবার হইবে। কি ? ভাব, কর্ম সব-কিছুর সমাধানকেই সমাধি বলে।

এখানে দ্বন্দ্ব নাই, দুই বলিয়া কিছু নাই — ইহা এক নিত্য বস্তু। তবে, আমাদের দেহের জন্য, আবরণের জন্য, ইহার উপলব্ধি হয় না। আবরণ কাটিয়া গেলে যা' আছে, তা'ই আছে।

প্রশ্ন : তাহা হইলে, মৃত্যু হইলেই কি সমাধিলাভ হয় ?

মা : দেহের মৃত্যু হইলেই যে উহা লাভ হয় তাহা নহে। মৃত্যুর যখন মৃত্যু হয় তখনই উহা লাভ হয়। ভয়ের যখন ভয়, তখন যেমন লোকে অভয় হয়, সেইরূপ

মৃত্যুর যখন মৃত্যু হয়, তখনই সব-কিছুর সমাধান হইয়া যায়, অর্থাৎ সমাধিলাভ হয়।

প্রশ্ন : তবে, সমাধিলাভ করিতে আমাদিগকে কিছু করিতে হইবে না।

মা : কিছু করিয়া যে নিত্য-বস্তু লাভ করা যায় তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে তো ভগবান্ কর্মের অধীন হইয়া পড়েন, কিন্তু তাই বলিয়া যে

কর্মের প্রয়োজন নাই তাহা নহে। এইমাত্র বলিলাম যে,

> নিত্য-বস্তু সর্বদাই আছে, শুধু আবরণের জন্য আমাদের উহা অনুভূতিতে নাই। এই আবরণ নষ্ট করিবার জন্যই আমাদের কর্মের প্রয়োজন।

যেমন, একটি মাটির হাঁড়ির ভিতর আলো জ্বালানো আছে, কিন্তু ঐ হাঁড়ির জন্য আলোর প্রকাশ নাই। যেই হাঁড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল অমনি আলোর প্রকাশ হইল। হাঁড়ি ভাঙ্গার জন্যই যে আলোটা হইল তাহা নয়, কারণ — আলো তো পূর্বেও ছিল, হাঁড়িটা ভাঙ্গিল বলিয়া উহার প্রকাশ হইল। সেই-রূপ চৈতন্যময় সত্তা তো নিত্যই আছে। তাহার অভাব তো কোন দিনই নাই।

> আমাদের আবরণের জন্যই উহার অভাব বোধ হইতেছে। এই আবরণ ভাঙ্গিবার জন্যই আমাদের কর্মের প্রয়োজন এবং আবরণ দূর হইলেই স্বয়ংপ্রকাশ নিত্য-বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়।

সাক্ষিস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ

প্রশ্ন ঃ 'ব্রহ্মস্বরূপ' এবং 'সাক্ষিস্বরূপ' এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য কি? আমরা তো ব্রহ্ম বলিতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মই বুঝি। সাক্ষিস্বরূপ বলিতে কি বুঝিব?

মা ঃ আচ্ছা, সাক্ষিস্বরূপ বলিতে কি বোঝো?

প্রশ্ন ঃ সাক্ষী যখন বলা হয় তখন বিষয়ের অস্তিত্ব

মানিয়া লওয়া হয়। সাক্ষী থাকিলেই সাক্ষ্য আছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থাতে বিষয় নাই। সেখানে এক ব্রহ্মই অসঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন।

মা : আচ্ছা, এই যে বলিলে যে, সাক্ষী বলিলে বিষয় মানিয়া লওয়া হয়, এই বিষয়ের জ্ঞানই বা কিরূপ ?

প্রশ্ন : অজ্ঞানীর নিকট বিষয় বা দৃশ্যবস্তু সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি দৃশ্য-বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া জানেন এবং জানিয়াই তিনি নির্বিকার দ্রষ্টা বা সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন।

মা : এই যে দ্রষ্টা বা সাক্ষীর কথা বলিতেছ ইহাও দুই রকমের হইতে পারে। অজ্ঞানীর কথা এখানে ছাড়িয়া দিলাম। যাহারা সাধন-ভজন করিয়া একটু উন্নত হইয়াছে তাহারা এই বাহ্য

জগৎকে মিথ্যা মনে করিয়া নিজকে ইহার সহিত না জড়াইয়া শুধু সাক্ষিভাবে ইহাকে দেখিয়া যাইতে পারে। এই যে এখানে সাক্ষী বলা হইল, ইহা কিন্তু প্রকৃত সাক্ষীর ভাব নয়। ইহাকে সাক্ষীর মত বলিতে পারো ; কারণ সাধক এখানে নিজকে সাক্ষী বলিয়া মনে করিতেছে। মনে করা, অর্থাৎ মানিয়া লওয়া। এই ভাব মানিয়া লইলে প্রকৃত সাক্ষী অবস্থা লাভ হয় না এবং এখান হইতে সাধকের পতনও হইতে পারে। প্রকৃত সাক্ষীর অবস্থা যখন আসে, তখন বাহ্য জগৎ যে অলীক বা মিথ্যা, তাহা আর মানিয়া লইতে হয় না। অর্থাৎ, উহা আর তখন মনের ব্যাপার নয় ; উহা তখন মিথ্যা বলিয়াই অনুভূত হয় এবং হয় বলিয়াই সাধক তখন নির্বিকার এবং অসঙ্গভাবে অবস্থান

করিতে পারে। তোমাদের শাস্ত্রেও বলে না যে, এক গাছে দুইটি পাখী আছে; উহার একটি ফল খায় এবং অন্য একটি বসিয়া বসিয়া উহা দেখে। যে পাখীটি এইভাবে দেখে, সে-ই দ্রষ্টা বা সাক্ষী।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, এই শেষোক্ত সাধককে কি জীবন্মুক্ত বলিতে পারি?

মা ঃ না, কারণ, এখানে দ্বৈতজ্ঞান আছে। ইহা হইল একটা অবস্থা — দাঁড়াইয়া কিছু দেখার অবস্থা। দ্বৈতবোধ থাকিলে মুক্তি কোথায়? তবে সাক্ষিস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ অর্থেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাক্ষিস্বরূপ সেই অবস্থারই ব্রহ্ম-স্বরূপ বলা যায়, যেখানে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। যেখানে মাত্র দ্বিতীয় পাখীটিই আছে, আর যে পাখীটি ফল খায় সে নাই। এই অবস্থায়

দ্বিতীয় পাখীটিকে দ্রষ্টা বা সাক্ষিস্বরূপ বলিতে পারো। উহা ব্রহ্মস্বরূপ ভিন্ন আর কিছু নয়। কাজেই, দেখিলে যে.

সাক্ষিস্বরূপ কথাটি তিন অর্থেই ব্যবহার করা যায় — প্রথম, সাক্ষীর মত, কিন্তু প্রকৃত সাক্ষী নয়; দ্বিতীয়, প্রকৃত সাক্ষী, কিন্তু এখানে দ্বৈতজ্ঞান আছে; এবং তৃতীয় সাক্ষিস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। এখানে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই।

সাধনপথে অহঙ্কার অন্তরায়

মা ঃ পথে চলিতে চলিতে যদি কিছুতে একটু আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়, তবে সেইখানেই ভিতরের অহঙ্কার আসিয়া ঘাঁটি বাঁধিয়া বসে।

তখন মনে হয় যে, এই আনন্দ আমিই লাভ করিয়াছি, কাজেই আমি একটা বিশেষ কিছু হনু। আমাদের ভিতরে যে অহং-ভাবটা আছে, তাহা তো সহজে যাইবার নয়। তাই কত সূক্ষ্মভাবে যে সে কাজ করিতে পারে তাহা বলা যায় না। আমি এতটা সময় ধ্যান-জপে কাটাইতেছি, আর সকলে কিছুই করে না ঃ আমি মাত্র একবেলা খাই, অন্যে দুইবেলা না খাইয়া থাকিতে পারে না ; আমি তিন বেলা স্নান করিতেছি তাহাতে আমার কিছুই হয় না, ইহারা সকলে একবেলা স্নান করিয়া সহ্য করিতে পারে না ; আমার এই-সব দর্শন হয়, অন্যের ইহার কিছুই হয় না—এইরূপ।

যে-কোন একটা উপলক্ষ ধরিয়া অহঙ্কার নিজকে জাহির করিতে পারে।

ইহার ফলে তাহাকে যে পরম লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছিতে হইবে তখন তাহা আর মনে থাকে না। পথে যে রস পাইল, তাহাতেই সে মজিয়া রহিল।

সাধনপথে যদি অহং-এর তেজ না আসিয়া দীনতার ভাবটা সঙ্গে থাকে, তবে পতনের আশঙ্কা অনেকটা কম।

তবে বাহিরে দীনতার ভাব দেখাইয়াও ভিতরে ভিতরে অহঙ্কার থাকিতে পারে। মুখে হয়তো বলিতেছে, "আমি কিছুই নই, সকলের চেয়ে আমি অধম", আবার ভিতরে অহঙ্কারের ভাব, এই-সব হইলেই পথে আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

সাধনপথে সত্যানুরাগ
লোভ ক্রোধাদির প্রকাশ

মা ঃ আধ্যাত্মিক পথে যাহারা চলিতে থাকে, তাহাদের ধীরে ধীরে সত্যের উপর একটা অনুরাগ ও নিষ্ঠা হয়।

এই অনুরাগ ও নিষ্ঠা লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং ইহারাও কতকগুলি স্তর আছে। সাধন এমন সাবধানভাবে কথা বলে, যেন কোন ভুল না হয়। আবার, মিথ্যা এড়াইবার জন্য তাহারা কথা অনেক কম বলে ঃ কারণ, বেশী কথা বলিলে কখন কিভাবে মিথ্যা বাহির হইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। যদি কথা বলিতে কখনও অসাবধানতাবশতঃ ভুল বাহির হইয়া যায়, অথবা যে ভঙ্গীতে কথাটা শুনা গিয়াছিল ঠিক সেই ভঙ্গীতে উহা বলা না হয়, তবে তৎক্ষণাৎ

শরীরে জ্বালা উপস্থিত হয়, অথবা শরীরে হুল বা কাঁটা ফুটিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা হয় এবং, এইরূপ জ্বালা-যন্ত্রণার জন্য সাধক, যাহার নিকট ঐরূপ ভুল বলিয়াছে তাহার কাছে গিয়া বলিতে বাধ্য হয় যে, সে যেভাবে কথাটা বলিয়াছে উহা ঠিক সেই-ভাবের নয়, উহা এইরূপ হইবে।

ভুল বা মিথ্যা বলিলে যে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়, তাহার কারণ আছে। সাধনার সময় সাধকের কেবল চিন্তাধারা নয়, তাহার লোমকূপ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শরীরের গতিই একমুখ হইয়া সত্যনিষ্ঠার দিকে চলিতে থাকে।

চলতি কোন জিনিস যদি হঠাৎ বাধা পায় তাহাতে যেমন ধক্কা লাগে, সাধকের বেলায়ও ঠিক ঐরূপ হয়। এই যে সত্যনিষ্ঠা-পথে দোষত্রুটি হইয়া

জ্বালা-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, ইহারও কিন্তু সার্থকতা আছে।

ঐ দোষত্রুটির জন্য যে অনুতাপ হয়, তাহাই আবার সাধককে সত্যনিষ্ঠার পথে আগাইয়া যাইবার গতি বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ঐ অনুতাপ না হইলে তাহার গতিটা হয়তো ততটা তীব্র হইত না। চলিবার পথে বাধা পাইয়া একদিকে যেমন তাহার অনুতাপ হয়, অন্যদিকে আবার সাবধানমত ঐ পথে চলার গতিও বৃদ্ধি পায়।

যদিও সত্যনিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথা-গুলি বলা হইল, লোভ, ক্রোধ, মোহের বেলায়ও ঐরূপ হয়। সাধকের কথায় ও ব্যবহারে যদি 'আমি' 'আমার' জাতীয় মমতাবোধক কিছু প্রকাশ হয় তবে তখনও ঐরূপ জ্বালাযন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

লোভের বেলায়ও তাহাই। কেহ হয়তো কিছু খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় খাওয়া লইয়া তাহাকে কিছু বলা হইল। সে যে উৎসাহ বা ক্ষুধা লইয়া খাইতে বসিয়াছিল উহা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল এবং রাগের বশে সে হয়তো তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল। আবার কেহ বা ঐ-সব কথা সহ্য করিয়া রাগটাকে কিছু দমন করিয়া খাইয়া উঠিল। কাহারও হয়তো ঐ কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল, এমন কি তাহার চক্ষু দিয়া জলও পড়িল — তবুও সে আহার ত্যাগ করিল না। তাহার মনের ভাবটা কতকটা এইরূপ — 'ভগবান্, আজ তুমি দুঃখের সঙ্গেই আমাকে আহার দিলে।' কেহ হয়াতা আবার রূঢ় কথাগুলি হাল্কা করিয়া নিয়া নিজের মধ্যে ক্রোধ বা দুঃখ আসিতে দিল না। আবার, কাহারও অবস্থা এমন

হয় যে, কোন কথাই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অপমানিত হইয়াও কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা বা কাহারও ক্ষতি করা এরূপ কোন ভাবই তাহার মনে উপস্থিত হয় না; এ-সকল বিষয়ে সে যেন একেবারেই অবশ। এগুলি হইল বিভিন্ন স্তরের বা অবস্থার কথা। কাহারও কাহারও ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে কোন্ অবস্থা হইতে ঐরূপ ব্যবহার করিতেছে।

সাধকের যতই ধৈর্যশক্তি বাড়িতে থাকে, উহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের তেজও বাড়িতে থাকে। সমস্তই তেজের খেলা কিনা।

তেজ সাত্ত্বিক হইতে পারে না, রাজসিক হইতে পারে, তামসিক হইতে পারে। তামসিক তেজে বিচারবুদ্ধি নাই। ক্রোধ হওয়া মাত্র তাহার প্রকাশ

হইয়া যায়। এখানে লোকে তেজের অধীন। রাজসিক তেজে বিচারবুদ্ধি আছে; ঐ অবস্থায় যাহা করা হয়, তাহা বিচারপূর্বক করা হয়।

সাধনা ও আশা

মা: তোমরা 'জীবন' বলিতে তো এই জীবন ধরিতেছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা তো ঠিক নয়। কত জন্মের সংস্কার যে তোমাদের মধ্যে আছে, তাহা তোমাদের জানা নাই। এই যখন অবস্থা, তখন লোকের শেষ সময় কি হইবে তাহা বলিবার উপায় নাই। এ দেহ বলে যে, সব-কিছুই হইতে পারে। সেইজন্য আশাটা ছোট রাখিতে নাই। ভাবনা দ্বারা যে স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া যায় তাহা তোমাদিগকে পূর্বেও বলিয়াছি।

এমনও দেখা যায় যে, লোকে শুধু উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিয়াই ঊর্ধ্ব স্তর হইতে আরও ঊর্ধ্ব স্তরে চলিয়া যায়। সেইজন্য আকাঙ্ক্ষাটা মহান্ রাখিতে হয়।

ভাবিতে হয়, তিনি যখন মুক্তির ভাবটা হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছেন তখন মুক্তিও দিয়া দিবেন। আলোর আভাস যখন ভাবনারূপে আসিয়াছে, তখন উহার পূর্ণ প্রকাশ হওয়াটা অসম্ভব কি? সন্দেহ, দুর্বলতা মাঝে মাঝে আসিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া দুর্বলতার আশ্রয় লইতে নাই। মহান্ আশা লইয়া কাজ করিয়া যাওয়া ভাল। কিছুই করিতে পারি না, নিজের কিছু করিবার শক্তি নাই — এই-সব কথা যে বলা হয়, এগুলি শুধু মুখের কথা। কারণ, সংসারের কাজ তো কিছু কিছু করিতেছ এবং কিছু

করিতে পারো বলিয়া মনে মনে বিশ্বাসও আছে। যদি নিজের কিছুই করিবার শক্তি নাই এই বিশ্বাসটি দৃঢ় হইত, উহা যদি অনুভূতিতে আসিত, তবে বুঝিতাম সাধনরাজ্যে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছ। কৃপা দ্বারাই যে সব হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সাধনের উদ্দেশ্যই এই যে, নিজের শক্তির সীমা অনুভব করা — প্রাণে প্রাণে বুঝা যে, আমার কিছুই করিবার শক্তি নাই।

আর মজাও এনন, সবই এমন সুন্দর যে, সাধনের অবস্থায় দেখা যায় আমরা তাঁহার হাতের যন্ত্র বই আর কিছু নই। ইহা অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ।

মা ঃ জগৎভরা যে দুঃখ-কষ্ট চলিতেছে তাহার কতটুকুই বা তোমরা দেখিতেছ? এও তাঁহারই খেলা। তিনি দুই হাতে তালি দিতেছেন. তিনিই গড়িতেছেন, আবার তিনিই ভাঙ্গিতেছেন। আবার দেখো, ভগবান্‌কে বলা হয় যে, তিনি মঙ্গলময়। এই যে দুঃখ-কষ্ট মৃত্যু চলিতেছে ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল আছে। তবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ভগবানের লীলা বুঝা শক্ত। উহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। সেইজন্য তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। কামনা, বাসনা, থাকিলেই দুঃখ। উহা ত্যাগ হইলেই দেখিবে দুঃখ বলিয়া কিছু নাই।

তুমি যে বলিলে, "সকলের ভাল না হইলে ভাল

থাকি কেমন করিয়া", এ-কথাই বা কে বলিতেছে? ইহা কি তুমি বলিতেছ? ইহাও তাঁহারই কথা। তিনিই তোমার মুখ দিয়া উহা বলিতেছেন. তিনি কিছু করিবেন বলিয়াই ঐরূপ বলিতেছেন. লোকে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে যাহা বলে তাহার ফলাফল কিছু হয়ই। এই যে তোমার সকলের প্রতি দয়ার ভাব প্রকাশ হইতেছে ইহারও কিছু সুফল থাকিয়া যাইবে।

ভাল-মন্দ লইয়াই জগৎ। কেহ যদি কোথাও সকলের ভাল করিতে চায়, তাহা কিন্তু সে পূর্ণভাবে করিতে পারে না। কতটুকু অবশ্য পারে, কিন্তু পূর্ণভাবে পারে না। অংশ নিয়াই তো পূর্ণ? অংশ বাদ দিলে পূর্ণ হয় কেমন করিয়া? কাজেই সকলের মঙ্গল করিতে গিয়া যদি একটিরও মঙ্গল

করা যায়, তাহাও সকলের মঙ্গলের পক্ষে প্রয়োজন। একেকে বাদ দিয়া তো আর সকল নয়।

সেবাধর্মের মাহাত্ম্য

মা : মনকে সর্বদা ধ্যান-জপাদি কাজে সৎসঙ্গে লাগাইয়া রাখিতে হয় এবং এইরূপ লাগাইয়া রাখিতে রাখিতেই একদিন তাহার প্রকাশ হইয়া যায়। কেহ-বা হয়তো ধ্যান-জপাদির পথ না লইয়া সেবাধর্ম লইয়া থাকে। সর্বভূতে ভগবান্ আছেন মনে করিয়া সে সাধ্যমত ভগবৎজ্ঞানে সকলেরই সেবা করিতে থাকে। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধব সকলই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মনে করিয়া তাহাদের সেবা করিতে করিতেও লোকে তাঁহার মহান্ প্রকাশটা পাইয়া যায়। ইহা ছাড়া এমন একটা

অবস্থা আছে সেখানে স্বভাবতঃই সেবার ভাবটা আসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় পৌঁছিলে জগতের দুঃখ কষ্ট এবং ক্রন্দনের রোল তাঁহার নিকট পৌঁছে এবং উহাতে সে আপনা-আপনি গলিয়া গিয়া আরও ঊর্ধ্ব দিকে বা শ্রেষ্ঠতর অবস্থা লাভের দিকে না গিয়া, ঐ দুঃখ-কষ্ট দূর করিতে লাগিয়া যায়। এই যে অবস্থার কথা বলা হইল, ইহা অবশ্য সাধারণ সেবাকার্য হইতে আলাদা। জাগতিক ভাবে যে সেবা করা হয় ইহাতে নিজকে অপর হইতে আলাদা রাখিয়া করা হয়। কাহারও অর্থ থাকিলে সে অপরকে অর্থ দিয়া সাহায্য করে। যাহার অর্থ নাই সে হয়তো শরীর দিয়া সাহায্য করে — এইরূপ। কিন্তু উহাতে দ্বৈত বুদ্ধি থাকিয়া যায়। পূর্বে যে অবস্থার কথা বলিলাম উহাতে

দ্বৈত বুদ্ধি নাই। নিজের দেহে ফোড়া হইলে যেমন আমরা উহা যত্নের সহিত সেবা করিয়া দূর করিতে চেষ্টা করি, সেইরূপ এই অবস্থায় জগতের দুঃখ-কষ্ট নিজেরই দুঃখ-কষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এখানে বলিতে পারো যে, নিজ দেহে যে ফোড়ার জ্ঞান, ইহাও তো আগন্তুক বিষয়ের জ্ঞান; কিন্তু এমন অবস্থাও আছে যাহাতে এরূপ কোন দ্বৈত-বোধেরও লেশ থাকে না।

হরিকথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা